গণগবেষণা : দারিদ্র্য দূরীকরণে হতদরিদ্রদের অনুসন্ধান

- মানিক মাহমুদ

আন্তর্জাতিক সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গণগবেষণা শুরু করে ২০০৫ এর জানুয়ারী মাসে। সংস্থাটি প্রথম ছয় মাস অতিক্রম করে গণগবেষণা কী ও কেন পর্যবেক্ষণ করে তা বুঝতে বুঝতে, পরের এক বছর চলে যায় গণগবেষণা-সহায়ক সৃষ্টি করার কাজে, এরপর দেখতে পেতে শুরু করে গণগবেষণার শক্তি – নতুন ও প্রেরণাদায়ক সব শক্তি। আড়াই বছর ধরে সংস্থাটি গণগবেষণার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে উপলব্ধি করে – মানুষ যতো হতদরিদ্রই হোক, যতো বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীই হোক, সম্পদ তাদের যতো কমই থাকুক, স্বাধীনভাবে যৌথচিন্তার সুযোগ থাকলে তাদের পক্ষেও এক অভূতপূর্ব আত্মশক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। আরো উপলব্ধিতে আসে, কেবল আত্মশক্তিই নয়, যৌথচিন্তা চর্চার মধ্য দিয়ে গণসংগঠন গড়ে ওঠার যে সংস্কৃতি শুরু হয়েছে এবং তাতে যৌথ মালিকানার অনুশীলন যেভাবে হচ্ছে – এর শক্তি সম্ভাবনাময় ও চ্যালেঞ্জিং। মানুষের ক্ষমতায়নের ধারায় বিশ্বাসী হয়েও, সংস্থাটি আবিষ্কার করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীগত একাধিক সীমাবদ্ধতা – যা তাদের অগ্রাধিকার নির্ণয় এমনকি কর্মকৌশল সংস্কারে পর্যন্ত উৎসাহিত করে তোলে। সংস্থাটি দেখতে পেয়েছে, তাদের যে সমন্বিত প্রত্যাশা – একটি ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠন করা, যা সমাজের বৃহত্তর সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের সম্পৃক্ততা ও স্বয়ংক্রিয় নেতৃত্ব ছাড়া অর্জন অসম্ভব – সেই নেতৃত্বও গণগবেষণার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা অনেক সহজ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ গণগবেষণা শুরু করে দু'টি ইউনিয়ন দিয়ে, বর্তমানে বারোটি ইউনিয়নে তা ছড়িয়ে পড়েছে।[১] কিন্তু সংস্থাটির উজ্জীবক সৃষ্টির কাজ শুরু হয় এক যুগেরও বেশি সময় আগে। প্রতিটি উজ্জীবক একটি চেতনা ধারণ করেন, যা সৃষ্টি হয় সংস্থাটির চার দিনব্যাপী 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ'-এর মধ্য দিয়ে। চেতনাটি হলো – 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না' তারা মনে করেন নিজে উজ্জীবিত থাকা এবং অন্যকে উজ্জীবিত করা তাদের দায়িত্বের অংশ – এ দায়িত্ব পালন করেন তারা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে। এই উজ্জীবকরাই "প্রত্যাশা" বাস্তবায়নের কান্ডারি – এদের সংখ্যা সারাদেশে লক্ষাধিক। উজ্জীবকরা বলেন – প্রত্যাশা অর্জনে আমরা একটি গণজাগরণ গড়ে তোলার কাজে সম্পৃক্ত – তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে জাগ্রত, সংগঠিত এবং সমবেত করার মাধ্যমে। একদল ছাত্র-ছাত্রীও এই গণজাগরণে সরাসরি স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে সম্পৃক্ত রয়েছে, যাদের সংখ্যাও প্রায় দেড় লক্ষ। গণজাগরণে উজ্জীবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এই সম্পৃক্ততার ভিত্তি তাদের দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ।

প্রক্রিয়া – যেভাবে শুরু হয় গণগবেষণা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট শুরুতে একদল উজ্জীবক ও তার স্টাফকে গণগবেষণার ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করে। সৈয়দপুরে ড. লেনিন আজাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (উগফা)-এর সহায়তায় পনের ও দশ দিনব্যাপী যথাক্রমে দু'টি গণগবেষণা কর্মশালার (২০০৫) মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। উগফার মাধ্যমে ২৫

---

[১] গাইবান্ধা জেলার মুক্তিনগর, ভরতখালি, জুমারবাড়ি, ঘুড়িদহ, উদাখালী ও পদুমশহর ইউনিয়নে, রংপুর জেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নে, রাজশাহী জেলার সরদহ ইউনিয়নে, খুলনা জেলার আড়ংঘাটা ইউনিয়নে, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ইউনিয়নে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গোকর্ণ ইউনিয়নে এবং নেত্রকোনা জেলার চল্লিশা ইউনিয়ন। ২০০৬-এ গণগবেষণা শুরু হয় সরদহ (জুলাই), আড়ংঘাটা (সেপ্টেম্বর) এবং চল্লিশা (সেপ্টেম্বর) ইউনিয়নে। ২০০৭-এ শুরু হয় গোকর্ণ (মার্চ) এবং শ্যামনগর (ফেব্রুয়ারী) ইউনিয়নে।

জন উজ্জীবক ও ২০ জন স্টাফ এ ধারণা লাভ করেন। অবশ্য এরও আগে (২০০৪) রিসার্চ ইনিসিয়েটিভশ, বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের ২২ জন স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্র-ছাত্রী গণগবেষণা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন গবেষক আলাউদ্দীন আলীর মাধ্যমে।

পরবর্তী সময়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট নিজেই তিন দিনব্যাপী একাধিক গণগবেষণা কর্মশালার আয়োজন করে। ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এসকল কর্মশালায় স্থানীয় অগ্রসর উজ্জীবকরা অংশ নেন।[২] কর্মশালার মধ্য দিয়ে উজ্জীবকরা পরিচয় ধারণ করেন গণগবেষণা-সহায়ক হিসেবে। এসকল কর্মশালায় পূর্ব নির্ধারিত কোন এজেন্ডা থাকে না। তবে সবাই মিলে আলোচনা করে যা বের করেন তার ধরন কমবেশি এরকম – মানুষ কে? পশু ও মানুষের পার্থক্য কী? জ্ঞান কী? বুদ্ধি কী? দরিদ্র কী? দরিদ্র কে? দারিদ্র্য কী? মানুষের মৌলিক চাহিদা, গণগবেষণা কী? গণগবেষণার প্রয়োজনীয়তা, গণগবেষণার প্রক্রিয়া, গণগবেষণা-সহায়কের ভূমিকা, উন্নয়নের বিভিন্ন ধারা, গণসংগঠন গড়ে তোলা ও তা টেকসই করার উপায়, শোষক, শোষণের ধরন প্রভৃতি বিষয়ে। কোন কোন কর্মশালায় সমাজ, রাষ্ট্র, শ্রেণী বৈষম্য, জবাবদিহিতা প্রভৃতি বিষয়ও এজেন্ডায় আসে। এই সকল বিষয়ের ওপর ধারণা নিয়ে গণগবেষণা-সহায়ক দায়িত্ব নেন নিজ ইউনিয়নে গণগবেষণা ছড়িয়ে দেবার এবং পরিকল্পনা করেন নিজেকে কিভাবে আরো শাণিত করবেন – যাতে করে গণগবেষণায় সহায়ক হিসেবে গঠনমূলক ভূমিকা রাখা সহজ হয়। গণগবেষণা-সহায়ক আরো পরিকল্পনা করেন প্রথমেই নিজ ইউনিয়নে তার মতো একদল (২০-৩০ জন) গণগবেষণা-সহায়ক সৃষ্টি করবেন। এই গণগবেষণা-সহায়করা দায়িত্ব নেন নিজ গ্রাম, পাড়া, মহল্লার – সেখানকার সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষদের সংগঠিত করার, তাদেরকে যৌথচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার। গণগবেষণায় এই সকল গণগবেষণা-সহায়কের ভূমিকা অনুঘটকের – হতদরিদ্র নারী-পুরুষদের মধ্যে নেতৃত্ব গড়ে তোলা, যাতে করে তারা নিজেরাই দ্রুত স্বাধীনভাবে যৌথচিন্তা ও উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতে যৌথ মালিকানা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

প্রক্রিয়ার ভেতরের সমস্যা ও সমাধান

ধারণা করা হয়েছিল, স্বেচ্ছাব্রতী এই উজ্জীবকরা গণগবেষণা-সহায়ক হিসেবে খুবই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন এবং সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করে দ্রুতই সরে দাঁড়াবেন। এ ধারণা একশ' ভাগ কাজ করে নি। শুরুতেই একটি ধাক্কা এলো – মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল, প্রায় ৩০ ভাগ গণগবেষণা-সহায়ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন – তারা কোন উদ্যোগই গ্রহণ করলেন না। কারণ খুঁজে পাওয়া গেল – অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার, তা তাদের নেই। কর্মশালায় তারা তাদের এই 'না বলা' প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি, কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, তা খোঁজার চেষ্টাও হয়তো করেন নি। যারা সক্রিয়তার সাথে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তাদের মধ্যেও একাংশে দেখা গেল তারা সত্যিকারের গণগবেষণা-সহায়ক হয়ে উঠতে পারছেন না। এটা বোঝা গেল, তাদের সহায়তায় সত্যি সত্যি হতদরিদ্রদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গণসংগঠন গড়ে উঠেছে বটে, তবে তার নেতৃত্ব ছিল ওই উজ্জীবকের হাতে অথবা হতদরিদ্রদের থেকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা 'অন্য' কারো হাতে। পর্যালোচনা সভায় প্রশ্ন উঠল – নেতৃত্ব সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষদের হাতে নয় কেন? সেই 'অন্য'দের থেকে ভয়ানক উত্তর এলো – তারা (হতদরিদ্র) এখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারেন নি, তাছাড়া তারা আমাদের নেতৃত্ব আশা করেন। এ সংকট এখনও আছে এবং তা দ্রুতই দূরীভূত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। যারা সঠিকভাবে সত্যিকারের গণগবেষণা-সহায়কের ভূমিকা নিতে পারলেন তাদের সংখ্যা মাত্র ৪০

[২] এ পর্যন্ত ১২টি তিন দিনব্যাপী গণগবেষণা কর্মশালা পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে নয়টি হয়েছে উজ্জীবকদের জন্য সহায়ক সৃষ্টির লক্ষ্যে অবশিষ্ট তিনটি হয়েছে গণসংগঠনের নেতাদের সদস্যদের জন্য।

ভাগ। এদের অর্জিত অভিজ্ঞতাই মূলত এখানে বিশ্লেষণ আকারে তুলে ধরা হবে। যদিও পরবর্তীতে এদের মধ্যেও অনেকে টিকতে পারেন নি – সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সীমাবদ্ধতার কারণে। এখানে যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা জরুরী এবং তা থেকে শিক্ষা নেবার মতো, তা হলো – এতো দ্রুত এবং কেবল কর্মশালার মধ্য দিয়ে গণগবেষণা-সহায়ক গড়ে তোলা যায় কি-না? বরং অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, গণসংগঠনগুলো থেকে গণগবেষণা চর্চার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্রদের মধ্য থেকে যে সকল গণগবেষক গণসংগঠনের নেতা হয়ে উঠেছেন, গণগবেষণাকে গতিশীল করার প্রশ্নে তারা গণগবেষণা-সহায়ক হিসেবে অনেক বেশি কার্যকর। এ শিক্ষা থেকেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২০০৬ এর জানুয়ারী থেকে তিন দিনের গণগবেষণা কর্মশালায় গণসংগঠনগুলো থেকে উঠে আসা নেতাদের অংশগ্রহণের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে।

গণগবেষণার শক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু গণগবেষক

গণগবেষণার শক্তি বোঝা যায় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের যৌথচিন্তা এবং এই যৌথচিন্তার আলোকে তাদের গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের, ভাবনার রূপান্তরের যতোটুকু প্রতিফলন ঘটেছে – তা এই যৌথচিন্তা ও উদ্যোগের মধ্যেই দেখা যায়। সংগঠিত এই হতদরিদ্র নারী-পুরুষরা যখন বলেন – আমরা এখন আর ক্ষুদ্রঋণ নেই না, আমাদের টাকায় এখন আমরা চলি – এই সিদ্ধান্ত তারা যখন প্রকাশ করেন এবং এ প্রকাশের যে আনন্দ – এই আনন্দের যে শক্তি – যেন তা হাজার বছরের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার এক দৃঢ় ঘোষণা। গণগবেষণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গণসংগঠনের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন বহু সংগঠন গড়ে উঠেছে, এসকল সংগঠনের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের গণগবেষণা এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এ অভিজ্ঞতা থেকেই সংস্থাটি শেখে, মানুষ স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পেলে, চাপিয়ে দেয়া কোন চিন্তার খপ্পরে না পড়লে, কারো কোন সাহায্য পাবার তারা আশা করেন না। নিচের একাধিক ঘটনা থেকে অনুসন্ধিৎসু গণগবেষকদের এমন আরো শক্তির সন্ধান করা সম্ভব।

'আমি একজন গণগবেষক'

গণগবেষণার চর্চা করেন সমাজের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত বা হতদরিদ্র নারী-পুরুষ।[৩] বারোটি ইউনিয়নে এমন মানুষের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। এদের অধিকাংশই নিজেদের এই বলে পরিচয় দেন – আমি একজন গণগবেষক। গণগবেষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে তারা বিশেষভাবে সম্মানিত বোধ করেন। এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো – নিজেকে গণগবেষক বললে আমরা মনের মধ্যে বেশি বেশি শক্তি পাই, নিজেকে অন্য দশ জনের থেকে আলাদা মনে হয়, কারণ আমরা মাথা খাটাই, চিন্তা করে নতুন কিছু বের করি। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মশক্তির প্রকাশ নিয়ে তাদের নিজেদের ভেতরেই সমালোচনা আত্মসমালোচনা রয়েছে – এই আলাদা পরিচয়, আলাদা শক্তি সংযত করা না গেলে শেষ পর্যন্ত কারো কারো মধ্যে অহংকার তৈরি হতে পারে, যা গণগবেষণার জন্য হতে পরে ভয়ানক ক্ষতিকর একটি দিক। যতো সীমাবদ্ধতাই থাক, এটা স্পষ্ট যে, নিজেদের সামর্থ্যকে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গীই সংশ্লিষ্ট হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গবেষক (subject)-এ পরিণত করেছে, গবেষণার লক্ষ্যবস্তুতে (object) পরিণত করতে পারে নি। এখানে আকর্ষণীয় একটি দিক হলো – গণগবেষক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বঞ্চিতদের মধ্যে দ্রুত একতা গড়ে ওঠার এক বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি

---

[৩] সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ বা হতদরিদ্র নারী-পুরুষ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হয় – যা তাদেরকে শোষক ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করে।

গণগবেষণার বিষয় – সমস্যা, সমাধান ও নতুন সম্ভাবনা

গণগবেষকরা বলেন, আমাদের যা সমস্যা তা নিয়ে আমরা আলোচনা করে সমাধান খুঁজে বের করি – এটাই আমাদের গণগবেষণা। তবে শুধু সমস্যা আর সমস্যার সমাধানই নয়, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়। মোটাদাগে গণগবেষণার বিষয়কে চার ভাগে ভাগ করা যায় – সামর্থ্যের বিকাশ, আয় বৃদ্ধি, সংগঠন সৃষ্টি ও অধিকার আদায়। সামর্থ্যের বিকাশ ঘটে যৌথ সংলাপের মধ্য দিয়ে। সংলাপে থাকে প্রশ্ন, সে প্রশ্নের আলোকে উত্তর খোঁজা, সেই উত্তরের সূত্র ধরে আবার প্রশ্ন। এভাবে প্রশ্ন-উত্তর-প্রশ্ন। প্রশ্ন-উত্তরের মাঝে যুক্ত হয় যুক্তি এবং যুক্তি খন্ডন – এই যে প্রক্রিয়া, এতে সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে।

আয় বৃদ্ধি বিষয়ে গণগবেষণা নিবদ্ধ থাকে সঞ্চয় করা, এ সঞ্চয়কে একক ও যৌথভাবে নতুন নতুন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, কিভাবে সংগঠনের প্রতিটি সদস্য এই সঞ্চয় কাজে লাগিয়ে তার সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে পারেন তার পথ খুঁজে বের করা, স্বচ্ছতার সাথে সঞ্চয় সংরক্ষণ ও হিসাব রাখার সঠিক উপায় বের করা প্রভৃতি। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও গণগবেষণার আর একটি আকর্ষণীয় দিক। যেমন, কোলকোন্দ ইউনিয়নে সমবায় দোকান, সঞ্চয় থেকে ঋণ নিয়ে বাই-সাইকেল কিনে (অন্যথায় শহরে যাতায়াত ব্যয়েই সিংহভাগ চলে যায়) রংপুর শহরে শ্রম বিক্রি করার ব্যবস্থা, ন্যায্য মূল্যে সার কেনার জন্য যৌথ উদ্যোগে সারের আড়ত গড়ে তোলা প্রভৃতি। সমবায় দোকান গড়ে উঠেছে ২০০৭-এ – চার গ্রামের গণসংগঠনের সমন্বয়ে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রাথমিকভাবে চার গণসংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫৫টি পরিবার এ দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সকল পণ্য ক্রয় করবে। গণগবেষকদের মধ্য থেকে এ দোকান পরিচালনার জন্য একজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মূলধন সরবরাহ করা হয় চার গণসংগঠনের সমন্বিত তহবিল থেকে। নীট লাভ যা হবে, তার তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি এবং একভাগ যাবে গণসংগঠনের সমন্বিত তহবিলে। এভাবে গণগবেষণার মধ্য দিয়েই বেড়িয়ে এসেছে – নিজেদের টাকা নিজেদের মধ্যে (self-help credit) ব্যবহার করার ধারণা এবং চড়া সুদে এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ না নেবার যুক্তি।

সংগঠন নিয়ে গণগবেষণা হয় – সংগঠনের উদ্দেশ্য কী হবে, লক্ষ্য কী হবে এবং সংগঠন কী কাজ করবে? সেই সংগঠনের নেতৃত্ব কারা দেবে ও সেই নেতৃত্বের মেয়াদ কত দিন হবে? আরো নতুন সংগঠন সৃষ্টির উপায়, সংগঠনে-সংগঠনে সমন্বয়ের উপায় খুঁজে বের করা প্রভৃতি।

অধিকার আদায় সম্পর্কিত গণগবেষণা হয় অনেক বেশি। পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন রোধে গণগবেষকরা অনেক সোচ্চার। এমন বহু উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে যে, নারী গণগবেষকরা এলাকায় ও এলাকার বাইরে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক দেয়া-নেয়া রোধ করেছেন। এ ধরনের কোন ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র নারী গণগবেষকরা দল বেঁধে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন, সচেতনতা সৃষ্টি করেন, আইনের কথা বলেন, এতে কাজ না হলে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, কাজী, ইমামদের ধমক পর্যন্ত দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। গাইবান্ধা জেলার ভরতখালি ইউনিয়নের গণগবেষক মোমেনা বেগম এতোটাই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন যে, পাশের ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত মানুষ তার সহযোগিতা চাইতে আসে এসব বিষয়ে। গণগবেষণার কারণে একাধিক গ্রামে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে মারামারি, গড়ে

উঠেছে পারস্পরিক-বন্ধন-সম্প্রীতি – প্রচলিত নিয়মে যা আগে সমাধান করা সম্ভব হয় নি। এ প্রক্রিয়ায় একাধিক গ্রামে পূর্বের তুলনায় কমেছে মামলা-মোকর্দ্দমা (যেমন, আড়ংঘাটা ইউনিয়ন, কোলকোন্দ ইউনিয়ন) পর্যন্ত। গণগবেষণা করে খুঁজে বের করেছেন – সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আরো তথ্য হাতের কাছে থাকা দরকার। এরই সূত্র ধরে, কোলকোন্দের নারী গণগবেষকরা গ্রামবাসীসহ দল বেঁধে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের কাছে জানতে চেয়েছেন – আমরা ওষুধ চাইলেই নাই বলেন কেন, আমরা জানি আমাদের জন্য সরকারী ওষুধ বরাদ্দ আছে। মুক্তিনগরের হাসপাতালে বহুদিন যেখানে কোন ওষুধ পাওয়া যায় নি, যেকোন অসুখের কথা বললে ডাক্তার তা ঠিক মতো না শুনেই ড্রামের গোলা ওষুধ নিতে বলতেন – দল বেঁধে ওপর পর্যায়ে অভিযোগ করার ফলে এখন সেখানে আগের তুলনায় বেশি ওষুধ প্রাপ্তি (এখনও অপর্যাপ্ত) নিশ্চিত হয়েছে।

শিক্ষা, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় বহনের ব্যবস্থা প্রভৃতি গণগবেষণার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়। নিরক্ষরতার খারাপ দিক, শিক্ষিত হলে কী লাভ তা নিয়ে গণগবেষণায় তুমুল আলোচনা হয়। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে যে, গণগবেষণার মাধ্যমে অনেক গণসংগঠনের নিরক্ষর সদস্যরা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সংগঠনের সঞ্চয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করেন – যা উচ্চশিক্ষা কিংবা শিক্ষার বড় কোন ব্যয় মিটানোর সময় এই অর্থ কাজে লাগানো হয়। এই সঞ্চয় থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে – রংপুরের কোলকোন্দ ইউনিয়নে এমন দু'টি ঘটনা ঘটেছে। তাদের অভিভাবকরা বলেছেন, এই অর্থ না হলে সন্তানদের কলেজে পড়াই হয়তো হতো না। খুলনার আড়ংঘাটা ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে এসওএস (সেভ আওয়ার স্টুডেন্টস) প্রোগ্রাম।[৪] এর আওতায় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সঞ্চয় করে (মা-বাবার সহায়তায়), অনেকে টিফিনের পয়সা জমিয়ে এই সঞ্চয় করছে এর উদ্দেশ্য তাদের ভবিষ্যত শিক্ষার ব্যয় মেটানোর জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ। তরুণ গণগবেষকদের (কলেজ পড়ুয়া) বড় ভাই-বোনদের সহায়তায় এই শিশুরা প্রতি সপ্তাহে সঞ্চয় জমানোর দিনে সবাই একসাথে বসে গল্প করে, আলাপ-আলোচনা করে – তাদের মতে এটাই গবেষণা। গল্পের বিষয় (এক সপ্তাহের উদাহরণ) – গেল সপ্তাহে আমি কী ভালো কাজ করেছি, আগামী সপ্তাহে আমি কী ভালো কাজ করব। গেল সপ্তাহের ভালো কাজের উদাহরণ হিসেবে কয়েকজন জানায়, (হীরা, পঞ্চম শ্রেণী) আমি আমার নিজের কাপড় পরিস্কার করেছি। (মনিশান্ত, পঞ্চম শ্রেণী) আমি আমাদের বাড়িতে ও স্কুলে একটি করে মোট দু'টি নিম গাছ লাগিয়েছি। (সালমা, চতুর্থ শ্রেণী) আমি আমার দু' ভাইকে নিয়ে বাড়িতে বাগান করার জন্য ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করেছি, আমার পরের সপ্তাহের ভালো কাজ হবে সেখানে ফুলের গাছ লাগানো। শিশুদের নিয়ে এই গণগবেষণায় ঝুঁকিও লক্ষ্য করা গেছে – যারা এ কাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করছেন – এদের একটি দলের একজনের (সুমী) কাছে সঞ্চয় সংগ্রহই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, শিশুদের সাথে গল্প করা, তাদের প্রশ্ন করার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করার চেয়েও। গণগবেষণা-সহায়করা এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলে, অন্যভাবে বলা যায়, তাদের ভূমিকায় আরো স্বচ্ছতা তৈরি করা সম্ভব হলে, আড়ংঘাটার এ উদ্যোগ বাংলাদেশে গণগবেষণায় নতুন অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, গণগবেষণায় কী হয়? গণগবেষণা মানে ধারাবাহিক মুক্ত আলাপ-আলোচনা, যুক্তি,

---

[৪] বর্তমানে দু'টি এসওএস দল গড়ে উঠেছে। দু'দলে সদস্য সংখ্যা ৪৫ জন, সহায়ক ৪ জন। আগামী মাসে আরও একটি দল গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে।

যুক্তি খন্ডন প্রভৃতি। এ আলোচনায় কেউ বক্তৃতা দেন না। অবশ্য বক্তৃতা দেবার প্রয়োজনও হয় না। কমবেশি সবাই কথা বলেন এখানে। আনুষ্ঠানিক নিয়ম নেই বলে কখনও কখনও একসাথে সবাই মিলে কথা বলায় হট্টগোল লেগে যায়। তবে এতে কোন অসুবিধা হয় না। কেননা, এখানে বহিরাগত কেউ থাকেন না, থাকলেও জ্ঞান বিতরণের কোন সুযোগ পান না তিনি। এখানে নেই কারো অহংকার দেখাবার তাগিদ। সেকারণে (হয়তোবা) গণগবেষকদের এ আলোচনায় তর্ক হয়, ভীষণ তর্ক হয়, দেখে মনে হবে যেন ঝগড়া, তর্কে দ্বিমত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন তাতে সবাই একমত হন। গণগবেষকরা জানান, যে কোন কাজ আমরা একসাথে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে করি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও দায়িত্ব ভাগ করে নেন সবাই নিজের থেকেই।

গণগবেষণা কর্মশালাগুলোতে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীরা দারিদ্র্যের কারণ খুঁজে বের করেন শতাধিক। এসব কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক। দারিদ্র্যের কারণের কারণও খুঁজে বের করা হয়, এবং এ আলোচনার সূত্র ধরে এর জন্য দায়ী কে তাও আলোচনা হয়। এ আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে দারিদ্র্য সৃষ্টির জন্য দায়ী – ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজ। কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্য, সাধারণত গণগবেষকরা প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন ব্যক্তিই বেশি দায়ী। এটি একটি বিশেষ প্রবণতা। অবশ্য এ নিয়ে যুক্তির লড়াই চলে, বহুক্ষণ। এবং এর দ্রুত সমাধান হয় না। পরবর্তী পর্যায়ে গণগবেষণায় এই 'ভাগ্য নির্ভর' দৃষ্টিভঙ্গির কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলে। আলোচনার এ প্রক্রিয়াতেই তাদের চোখে ধরা পড়ে তারা শোষিত এবং শোষক যারা তারা তাদের তুলনায় সংখ্যায় কম হয়েও অনেক শক্তিশালী। পরবর্তীতে অবশ্য গণগবেষকদের লড়াইটা চলে এই শক্তির বিরুদ্ধেই। তাদের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি হয় বলেই হতদরিদ্রদের নেতৃত্বে যেসকল গণসংগঠন গড়ে ওঠে সেসকল গণসংগঠনের নেতৃত্ব সুবিধাভোগী শ্রেণী চেষ্টা করেও ছিনতাই করতে পারেন না। গণসংগঠন স্বয়ংক্রিয় ও টেকসই হবার এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

২২১টি গণসংগঠন[৫]

গত আড়াই বছরে বারোটি ইউনিয়নে ২২১টি গণসংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে। এই গণসংগঠনগুলো একাধিক কারণে সাধারণ সংগঠনের থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্ন চরিত্রের। গণসংগঠন পরিচালিত হয় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের নেতৃত্বে – আর এই নেতা নির্বাচন করেন সকলে মিলে আলোচনা করে। কেউ প্রভাবিত হবার ও কাউকে প্রভাবিত করার কোন সুযোগ থাকে না এ প্রক্রিয়ায়। কোন নেতা কত দিন দায়িত্ব পালন করবেন, তার দায়িত্ব কী হবে, তাও আলোচনার মধ্য দিয়ে স্থির হয়। কেবল নেতা নির্বাচনেই নয়, গণসংগঠনের যেকোন সিদ্ধান্তে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এই গণসংগঠন স্বাধীন সংগঠন হিসেবেও পরিচিত এবং হতদরিদ্র নারী-পুরুষরা যে এসকল স্বাধীন সংগঠনে পূর্ণ মালিকানা বোধ করেন তার প্রমাণ মেলে তাদের স্বত:স্ফূর্ত মন্তব্যে – এগুলো 'আমাদের সংগঠন' – কারণ **'এখানে সবই আমাদের; বুদ্ধি আমাদের, টাকা আমাদের, সিদ্ধান্তও আমাদের'**। অবশ্য ভিন্ন চিত্রও রয়েছে। রাজশাহীর সরদহ ইউনিয়নে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠলেও অধিকাংশগুলোতে গণগবেষণা-সহায়কদের কিংবা তাদের পরিচিতদের (অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর) হাতে নেতৃত্ব রয়ে গেছে, হতদরিদ্রদের নেতৃত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

[৫] কোলকোন্দ ইউনিয়নে ৪৫টি, ভরতখালি ইউনিয়নে ৩১টি, মুক্তিনগর ইউনিয়নে ২১টি, ঘুড়িদহ ইউনিয়নে ১১টি, জুমারবাড়ি ইউনিয়নে ১৫টি, পদুমশহর ইউনিয়নে ৫টি, উদাখালী ইউনিয়নে ৬টি, সরদহ ইউনিয়নে ১২টি, শ্যামনগর ইউনিয়নে ১৫টি, আড়ংঘাটা ইউনিয়নে ৩০টি, চল্লিশা ইউনিয়নে ১৬টি এবং গোকর্ণ ইউনিয়নে ১৪টি গণসংগঠন। দেখে বা শুনে প্রভাবিত হয়ে যে সকল সংগঠন (প্রায় ১০০টি) গড়ে উঠেছে তার সংখ্যা এর বাইরে।

হতদরিদ্রদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে সেগুলোকে এখনও পর্যন্ত গণসংগঠন হিসেবে বিবেচনাও করা হচ্ছে না – সেখানে আরো গণগবেষণা দরকার। কিন্তু কেন সরদহতে লীডারশীপ শিফট হচ্ছে না, কী সীমাবদ্ধতা কিংবা কী বাঁধা কাজ করছে, তা হাঙ্গার প্রজেক্ট এখনই খুঁজে বের না করলে এ সংকট সংক্রমিত হতে থাকবে।

গণসংগঠন গড়ে ওঠে দু'ভাবে – আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দেখে বা শুনে প্রভাবিত হয়ে। দেখে বা শুনে সংগঠন গড়ে ওঠে দু'ভাবে – অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দেখে, আয়বৃদ্ধির বাসনায় এবং সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে। অবশ্য কোন কোন সংগঠনে আবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড – দুটোই থাকে। এসকল সংগঠন চলে নিজের মতো, এর সবগুলোতে গণগবেষণার চর্চা হয় না – কারণ উদ্যোক্তারা জানেনও না গণগবেষণা কী এবং কোথা থেকে এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এ ধরনের একাধিক সংগঠন রয়েছে, এর সদস্যরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারেন অনেক পরে। গণগবেষণা স্বাধীন চরিত্র ধারণ করতে পারে বলেই এমনটা ঘটে। গণগবেষণার এটি একটি বিশেষ শক্তি এবং এই শক্তি ক্রমবিকাশমান।

এখানে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হলো – গণসংগঠনতো বটেই, এমনকি দেখে বা শুনে গড়ে ওঠা এই নতুন সংগঠনগুলোতেও অর্থ কোন মূল শক্তি নয়, পরিবর্তনের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ এবং এর ওপর মালিকানাটাই মূল শক্তি। সংগঠিত হবার অনুপ্রেরণাটাই এখানে অনেক বেশি জরুরী, অর্থের চেয়ে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। কোলকোন্দের বিনবিনা চরে চারটি সংগঠন গড়ে ওঠে গত বছর। স্থানীয় পর্যায়ে বলিষ্ঠ গণগবেষণা-সহায়ক গড়ে ওঠে নি বলে সংগঠনগুলোতে গণগবেষণা দানা বাঁধে নি। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরেও একসাথে বসে আলোচনা করার শক্তিটা তারা উপলব্ধি করেছেন – আলোচনার (২৬ মে, ২০০৭) এক পর্যায়ে তারা বলতে থাকেন – একসাথে কথাবার্তা বললে মাথা খুলে যায়, একতা বাড়ে, একতা হলে স্বাধীনতা বাড়ে। এই একতাই দরকার, একতা থাকলে টাকার জন্য কোথাও আর হাত পাততে হয় না। এই চরবাসীর জীবন ব্যবস্থা প্রকৃতিনির্ভর – তাদের বর্ণনা থেকে উঠে আসে – এখানে বছরে কমপক্ষে একবার ভিটা পাল্টাতে হয়, সারা বছরের যে সঞ্চয় তা এই নতুন ভিটা বানাতেই ফুরিয়ে যায়। এটা যে কত বড় চ্যালেঞ্জ তা ভুক্তভোগীরা ছাড়া অন্যদের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। এর বাইরে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সেখানে নেই স্বাস্থ্য সুবিধা, শিক্ষায় আরো অনগ্রসর। কিন্তু প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে তাদের যে প্রাণশক্তি, গণগবেষণার সামান্য ছোঁয়া তাকে আরো গতি দিয়েছে। এখানে যদি আরো দক্ষ সহায়ক এসকল সংগঠনে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে স্বাধীনভাবে গণগবেষণার চর্চাকে উৎসাহ দেয়, তবে অন্য যেকোন এলাকার তুলনায় এখানে বহুগুণ শক্তিশালী গণগবেষণার দৃষ্টান্ত গড়ে উঠবেই। ফলে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই চর্চায় এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যতো হতদরিদ্রই হোক, যতো বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীই হোক, সম্পদ তাদের যতো সীমিতই হোক না কেন, মুক্তভাবে যৌথচিন্তার সুযোগ থাকলে, যতো ঝুঁকিই থাক, সেই হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসবেই। অথচ, মানুষের এই শক্তিকে আমরা খর্ব করি, অন্যের স্বাধীনতাকে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অত্যন্ত ক্ষুদ্র কারণেই। বাংলাদেশে অনেক এনজিও উন্নয়নের নামে এ অসুস্থ চর্চাই চালিয়ে যাচ্ছে।

চিন্তার স্বাধীনতা কেড়ে নেবার আগ্রহ না থাকলেও, মুক্ত ও যৌথচিন্তার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারার কারণে, একাধিক এলাকায় দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহায়তায় গড়ে ওঠা বহু সংগঠন টেকসই হয় নি। টাঙ্গাইল জেলার গয়াহাটা ইউনিয়ন (২০০১-২০০৩) এর একটি। অবশ্য সংগঠনটির সাথে তখন

গণগবেষণার পরিচয় ঘটে নি। ওই ইউনিয়নে স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবকের সংখ্যা তিন শতাধিক। এই উজ্জীবকদের নেতৃত্বে ২০০১ সালের শুরু থেকে সাত-আট মাসে ৬৫টির অধিক স্থানীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সকল সংগঠনে তিন হাজারের অধিক নারী-পুরুষ সম্পৃক্ত হন এবং তারা লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন। এ সঞ্চয় বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ছোট ছোট আত্মকর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়। গড়ে ওঠে কিছু যৌথ সামাজিক উদ্যোগও। এসকল সংগঠনে সেখানকার কিছু সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত মানুষও সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু সংগঠন গড়ে ওঠার কিছু দিন পর থেকেই জটিলতা শুরু হয়, কমবেশি সব সংগঠনেই। এমনও হয়, গড়ে ওঠার কয়েক মাস পরে অনেক সংগঠন ভেঙ্গেও পড়ে। আর ২০০৩ এর পর দেখা যায় প্রায় ৯০ ভাগ সংগঠনই হারিয়ে যায়। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষদের সমন্বয়ে। এ মিশ্রতার কারণে সংগঠনের নেতৃত্ব ছিল তুলনামূলক অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা অগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের হাতে অথবা তাদের পক্ষের লোকের হাতে। ফলে এসকল সংগঠনে যতোটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতো তাতে যৌথচিন্তার পূর্ণ প্রতিফলন ছিল না। একারণে হতদরিদ্র শ্রেণীর নারী-পুরুষরা কখনোই সেখানে তাদের নেতৃত্ব ও পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি। সংগঠন ভেঙ্গে পড়ার এটা ছিল একটি অন্যতম মৌলিক কারণ। আর একটি কারণ ছিল তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হোসেন চৌধুরী সংগঠনগুলোকে আশ্বাস দিয়েছিলেন (গড়ে ওঠার আগে ও পরে) – সরকারী আর্থিক সাপোর্ট পাওয়া যাবে।[৬] কিন্তু তিনি চেয়ারম্যান থাকতে থাকতে এই অর্থ ছাড় হয়ে আসে নি। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে অপপ্রচার হতে শুরু করে যে, আবুল হোসেন চৌধুরী এই টাকা পেয়েছেন এবং তিনি তা ভোটের কাজে ব্যবহার করছেন। এই অপপ্রচার চলতে চলতেই ভোটের সময় চলে আসে, এবং তিনি ভোটে হেরে যান।[৭] নতুন চেয়ারম্যান এসে এই অর্থ আর সংগঠনগুলোকে বরাদ্দ দেন নি, স্থানীয় অনেকে বলেছেন, ইচ্ছে করেই দেন নি। সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যদি যৌথচিন্তার পরিবেশ থাকতো, তাহলে চেয়ারম্যানের জবাবদিহিতা থাকতো, ফলে তিনি হুট করে আলাপ না করেই এমন ঘোষণা দিতে পারতেন না। গণগবেষণার পরিবেশ থাকলে, এ ঘোষণা দিলেও গণগবেষকরা যৌথচিন্তার মাধ্যমে অবশ্যই এ সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, অন্যান্য এলাকার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

'একতাই শক্তি – এ বন্ধন কুড়াল দিয়ে চোট মারলেও ভাঙ্গবে না'

গণগবেষণার একটি লক্ষ্যণীয় অর্জন হলো গণগবেষকদের পারস্পরিক-বন্ধন, তাদের কথায় যা একতা। এই একতা গণগবেষকদের মধ্যে পরনির্ভরশীলতামুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণকে তরান্বিত করেছে। একতার কারণেই একসাথে চিন্তা করা, একসাথে ঝুঁকি মোকাবিলা করা এবং একসাথে নতুন পথ অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক নিখাঁদ ঐক্য ও দৃঢ় বন্ধন। এই একতার কারণেই গড়ে ওঠে সচেতনতা – সচেতনতা থেকে অধিকারবোধ – এবং অধিকারবোধ থেকে গড়ে ওঠে প্রতিবাদ করার মানসিকতা। এই একতা ও বন্ধন সম্পর্কে খামার ধনারুহা গ্রামের একজন গণগবেষক মন্তব্য করেন – 'আমরা যারা গণগবেষক, যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবাই এক, আমরা সবাই বন্ধু, আমাদের এ বন্ধন আত্মার। এ বন্ধন কুড়াল দিয়ে চোট মারলেও ভাঙ্গবে না।' সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের একতার এমন উদাহরণ হাঙ্গার প্রজেক্টের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। এমন একতার কারণে গণগবেষকরা এলাকায় একটি

---

[৬] তার পরিকল্পনা ছিল 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প থেকে কিছু অর্থ তিনি এই সংগঠনগুলোকে দেবেন। ঘোষণা অনুযায়ী এই অর্থ দেবার ব্যাপারে তার পূর্ণ আন্তরিকতা ছিল।

[৭] অনেকে অনুমান করেন এই অপপ্রচার তার ভোটে হেরে যাবার একটা অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য, উজ্জীবকদের নিয়ে কাজ করার কারণে তিনি এলাকায় খুবই জনপ্রিয় একজন চেয়ারম্যানে পরিণত হন।

বিশেষ শক্তি হয়ে উঠেছেন। গণবেষকদের এ পজিশনকে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও গুরুত্ব দিয়ে চলে। এই একতা ও বন্ধন ভাঙ্গার উদাহরণও আছে ওই একই এলাকায়। খামার ধনারুহা গ্রামের গণগবেষণা-সহায়ক মমিন ও এনামুল স্বাধীনভাবে যৌথচিন্তা ও হতদরিদ্রদের মাঝে নেতৃত্ব সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেন, যা ছিল অনুপ্রেরণামূলক, সেই তারাই আবার একসময় এর বাধা হয়ে দাঁড়ান। এর অন্যতম কারণ মমিন ও এনামুলের স্বেচ্ছাশ্রমের (!) ওপর হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীদের অধিক নির্ভরশীলতা, যা অনুঘটকসুলভ ছিল না, বরং তা ছিল কোন স্বেচ্ছাব্রতীকে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার জন্য বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক। গণগবেষণা-সহায়ক হিসেবে এই মমিন ও এনামুল অর্জন করেছিল এলাকায় সকলের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। এই অধিক গ্রহণযোগ্যতা তাদের অন্ধ করে তোলে – নিজের অজান্তেই এই অন্ধত্বের কারণে তারা নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির বদলে সকলের নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেন, চর্চা শুরু করেন অন্যের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার মতো অসুস্থ এক প্রক্রিয়া।

'মুক্তিনগরে আর বাল্যবিবাহ হবে না'

গণসংগঠন ও যৌথচিন্তার ফলে সংশ্লিষ্ট হতদরিদ্রদের মাঝে একতা ও সামর্থ্যের যে বিকাশ ঘটেছে তা প্রেরণাদায়ক। বাল্যবিবাহ রোধে অন্যান্য ইউনিয়নের গণগবেষকরাও সোচ্চার, কিন্তু মুক্তিনগর ইউনিয়নের গণগবেষকরা ছিল এ ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে – সেখানে সত্যিই বাল্যবিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করা সম্ভব হয়েছিল। এর প্রকাশ দেখা যায় 'মুক্তিনগরে আর বাল্যবিবাহ হবে না' – সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের, বিশেষ করে হতদরিদ্র নারীদের সমবেত এই ঘোষণায়। মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদ ও অধিকাংশ সাধারণ গ্রামবাসীর এই ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ততা ঘটেছিল। অনেকের কাছে এটা বিস্ময়কর একটি প্রশ্ন যে, হতদরিদ্ররা কিভাবে স্থানীয় সকলকে সম্পৃক্ত করে এমন একটি ইস্যুতে সমবেত ঘোষণা দিতে সক্ষম হলেন – গণগবেষণার কি এতই শক্তি! আসলে অন্য কিছুই নয়, শক্তিটি হলো একতা, যৌথচিন্তার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্ররা যা আবিষ্কার করেছেন। একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীতে নারীদের এমন উদ্যোগে পুরুষরা বাধা না হয়ে সহযাত্রীর ভূমিকা পালন করেন। পুরো ঘটনাটি বিচ্ছিন্নভাবে একটি ইউনিয়নে ঘটলেও এর তাৎপর্য আলাদা। বিশেষ করে, বিশ্বায়ন ও তার দোসর এনজিওদের এই দাপটের সময়ে, যখন কিনা অধিকার নিশ্চিত করার নামে শোষণের জাল আরো বহু দূর বিস্তৃত হচ্ছে, তখন প্রায়-বিচ্ছিন্ন, স্বপ্নহীন এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই গড়ে ওঠা 'একতা' এবং এর গুরুত্বের দিকটি ভেবে দেখার দাবি রাখে।

গণগবেষকরা মুক্তিনগরে ২০০৫ থেকে ২০০৭ এর মার্চ পর্যন্ত মোট ৬০টির অধিক বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। গণগবেষকরা জানান, 'বাল্যবিবাহ হচ্ছে, সেটা নিজের গ্রামেই হোক আর অন্য গ্রামেই হোক, এ খবর শুনলে আমরা আর স্থির থাকতে পারি না'। শুরুর দিকে গণগবেষকরা নিজেরাই খবর নিতেন। এখন পরিস্থিতি উল্টো। কোথাও বাল্যবিবাহের প্রস্তুতি চলছে, এ খবর পাশের বাড়ির কেউ, এমনও হয়েছে মেয়ের মা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন গণগবেষকদের। সাধারণত পড়শীরা অভিভাবকদের বোঝাতে ব্যর্থ হলেই তবে গণগবেষকদের জানান। প্রথম দিকে গণগষেকরা যখন বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে যেতেন, তখন অভিভাবকরা বিরক্ত হতেন এবং কখনও কখনও হুমকিও দিতেন। এখন আর তা ঘটে না। এখন গণগবেষক যাওয়া মানে ওই বিয়ে নিশ্চিত বন্ধ হওয়া। ২০০৪ সালের শুরুতেও মুক্তিনগরে প্রতি মাসে যেখানে একাধিক বাল্যবিবাহ হতো, এখন তা অকল্পনীয়। গণগবেষদের এমন সফলতার কারণেই গ্রামবাসীরা তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বলেন 'গণগবেষকরা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে বেড়ায়'।

মুক্তিনগরের হতদরিদ্র নারীরা এ কাজ করেন এককভাবে ও দল বেঁধে। গণসচেতনতা সৃষ্টি করেই তারা এ

কাজকে এগিয়ে নেন। তারা খুঁজে বের করেছেন, 'বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য ও সামাজিক কুসংস্কার হওয়ায় সব সময় সচেতনতা সৃষ্টি করে কাজ হয় না'। ফলে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে তাদের আইনের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে হয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে মুক্তিনগরে কাজী, ইমাম, ঘটকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা পর্যন্ত করতে হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামবাসী বাল্যবিবাহ বন্ধের পক্ষে থাকায় গণগবেষকদের কাজ এমন সহজ হয়ে উঠেছে। এভাবে বহু দিনের একটি পুরোনো কুসংস্কারে আঘাত লাগায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা মুক্তিফৌজ[৮]

ভরতখালি ইউনিয়নের ভাঙ্গামোড় এলাকার গণগবেষকরাও স্থির করেছেন তাদের ইউনিয়নেও আর বাল্যবিবাহ হতে দেবেন না। বাল্যবিবাহ বন্ধে এই এলাকার নেতৃত্ব দিচ্ছেন গণগবেষক দলের নেতা মোমেনা বেগম। কিভাবে বাল্যবিবাহ কমে আসছে জানতে চাইলে ভরতখালি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জানান, মোমেনার পিছনে মৌমাছির দল আছে, ফলে আমার কিছু করতে হয় না। এখানে কেউ কোন বাল্যবিবাহ দেবার চেষ্টা করলে মৌমাছির কামড়ে টিকতে পারবে না। বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যরা জানান, আমরা মুক্তিফৌজ – আমরা গ্রামে গ্রামে আরো মুক্তিফৌজ, লীডার তৈরি করেছি – তারপরেও কাজী, ইমামরা টাকার লোভে বাল্যবিবাহ দেবার চেষ্টা করবে – কিন্তু গ্রামবাসী আমাদের সাথে আছে, ফলে বাল্যবিবাহ কেউ দিতে পারবে না – আর চেয়ারম্যান কোন বাল্যবিবাহ দেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করলে তাকে চৌদ্দ শিকের ভাত খেতে হবে। কিন্তু মুক্তিনগরে যেমন এই শক্তির পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টির একটি চেষ্টা যুক্ত আছে, ভাঙ্গামোড়েও তেমন উদ্যোগ আছে বটে, তবে বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দেয়ার মধ্যেই যেন বেশি আগ্রহ ও সন্তুষ্টি – এমন প্রবণতা আন্দোলন বিরোধীদের শক্তি জোগাতে পারে।

'আমি টাকা খেতে আসি নি; আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেছি, সমস্যা সমাধান করতে এসেছি'

মোমেনা বেগমের শক্তির আর একটি উদাহরণ দেয়া যায়। গণগবেষকদের মধ্যে যাদের বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রাখার কাজ নেশায় পরিণত হয়েছে – মোমেনা বেগম এদের অন্যতম একজন। তিনি একাই একাধিক বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রেখেছেন। এ কাজে তিনি বাধার মুখোমুখী হয়েছেন একাধিকবার, কিন্তু থামেন নি। মোমেনা বেগম জানান, 'আমার এলাকায় অনেক পুরুষ বাল্যবিবাহের পক্ষে। গতকালই (২০০৫) একটা বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছি। মেয়ের বয়স ছিল ১২ বছর এবং ছেলের বয়স ছিল ১৬ বছর। এ বিয়েতে ৫,০০০ টাকা যৌতুকও ঠিক করা ছিল। আমি বাধা দেই। ইউপি সদস্য আমাকে বলেন, এ বিয়ে হবে। আমি প্রশ্ন করি, আপনি এ সিদ্ধান্ত দেবার কে? তাছাড়া এটা বেআইনী সিদ্ধান্ত। আপনি তো আইনের লোক। এ বিয়ে নিয়ে আর একটা কথা বললে কাজী ও ঘটকের বিরুদ্ধে মামলা করবো। আপনি বিরোধিতা করলে আপনার বিরুদ্ধেও মামলা করবো। ইউপি সদস্য আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, এই মহিলা তুমি এসব কী বলো? তুমি এত মাতবরী করো কেন? তুমি কী চাও? আমি বলি, ঘটক দু'দিক থেকে টাকা খাবে, কাজীও টাকা পাবে। আমি গণগবেষক, আমি টাকা খেতে আসি নি; আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেছি, সমস্যা সমাধান করতে এসেছি।'

এসব কথা যখন মোমেনা বেগম ব্যাখ্যা করতে থাকেন, তখন তার সামনে থাকলে অনুধাবন করা যায়, কী

---

[৮] গত ২৮ মে ২০০৭ অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমানের উপস্থিতিতে গাইবান্ধা জেলার ভরতখালি ইউনিয়নের ভাঙ্গামোড়ে সেখানকার ১০টি গণসংগঠনের ৩৩ জন সদস্য মিলে যে যৌথ আলোচনা করেন সেখানেই মুক্তিফৌজ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, মুক্তিফৌজ বলতে তারা বুঝিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধার মতো শক্তি ও সাহসসম্পন্ন ব্যক্তি।

অমিত শক্তি তিনি ধারণ করেন! জানতে চেয়েছিলাম, এই শক্তি আপনি অর্জন করলেন কিভাবে। জবাবে মোমেনা বেগম বলেন – সবাই মিলে একসাথে বসে চিন্তা করলেই এ শক্তি হয়। এই শক্তির জন্য শিক্ষিতদের মতো অতো লেখাপড়া করতে হয় না।[৯] একই সময়ে মোমেনা বেগম আগ্রহী হয়ে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা শোনান। '... সেদিন এক ভ্যানচালক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মেয়েরা বাল্যবিবাহ বন্ধ করে বেড়াচ্ছে বলে পুরুষদের হায়াত কমে যাচ্ছে। এ কথা শোনার পর তো আমার খুব রাগ হলো, মাথাটা একবারে চক্কর দিয়ে উঠলো। আমি ভ্যান থাকি লাফ দিয়ে নামি তাকে বললাম, এই মিয়া ভ্যান থামান। আগে জবাব দেন – কিভাবে হায়াত কমে? আমার প্রশ্ন শুনে তো ড্রাইভার চকচন্দ (অবাক) নাগি গেল। মুখে কোন উত্তর নাই। আমি ফির বললাম, না জানি কথা বলেন কেন? খবরদার এই ধরনের কথা আর জীবনে বলবেন না। তাহলে এই রাস্তা দিয়ে ভ্যান চালাতে পারবেন না।' এসব কথা আগে জানতাম না – গণগবেষক না হলে আমি বোকাই থাকতাম – এখন দেখি কেটা (কে) ঠকায় হামাক (আমাকে)'। আসল কথা হলো, চিন্তার স্বাধীনতা এবং তার চর্চার সুযোগ থাকলে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষও যে কতখানি স্পষ্টবাদি হয়ে উঠতে এবং শক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন তার প্রমাণ মেলে গণগবেষক মোমেনা বেগমের এসব প্রতিবাদী আচরণে।

গণগবেষকদের 'ক্যারিসমেটিক লীডার' মোমেনা বেগম

ভরতখালি ইউনিয়নের এই পঁয়ত্রিশোর্ধ মোমেনা বেগমের মতো গত আড়াই বছরে গণগবেষকদের মধ্য থেকে একাধিক নেতা সৃষ্টি হয়েছেন। মোমেনা বেগম কেবল গণগবেষকদের নেতা নন, এলাকার একজন জনপ্রিয় নেতায় রূপান্তরিত হয়েছেন, তিনি অনেকের কাছে এখন অনুকরণীয়। মোমেনা বেগম কতটা ক্যারিসমেটিক, তা বোঝাতে অন্য একজন গণগবেষক তার (মোমেনা বেগমের) কাজের একটি বাস্তব দৃশ্য বর্ণনা করেন – 'মোমেনা বেগম একাই অথবা কাউকে সাথে নিয়ে ছুটেছেন পাশের কোন গ্রামে। কিছু দূর যেতেই তা নানা বয়সী মানুষের একটা ছোটখাটো মিছিলে পরিণত হয়ে ওঠে। মিছিলটি যাচ্ছে একটি বাল্যবিবাহ ঠেকাতে। ... মিছিল গন্তব্যে পৌঁছলো, আলোচনা হলো এবং বিনা বাধায় বাল্যবিবাহটি বন্ধ হলো।' ভরতখালি ও এর আশেপাশের এলাকায় এমন ঘটনা নাকি প্রায় প্রতি সপ্তাহের চিত্র। সব ঘটনাই কিন্তু এমন সরলভাবে ঘটে না – অতিক্রম করতে হয় নানা বাধা, হজম করতে হয় অনেক নেতিবাচক সমালোচনা। মোমেনা বেগম কোথাও হাজির হলে অন্যান্য গ্রামবাসীও দ্রুত উপস্থিত হন। মোমেনা বেগম সেখানে শুরু করেন, শুধু একটা-দুটো প্রশ্ন তোলেন, তারপর উপস্থিত গ্রামবাসীরাই আলোচনা-সমালোচনা চালিয়ে নেন। এই সকল ক্যারিসমেটিক ভূমিকার কারণে মোমেনা বেগম সেখানকার নারী গণগবেষক ও কিশোরীদের কাছে এখন স্বপ্ন। তারা বড় হয়ে 'মোমেনা বু-র মতো' হতে চায়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এ ধরনের গণগবেষণা দলের নেতাদের একত্র করে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির কোন উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করে নি। অথচ, এই নেতারা যদি গণগবেষণা-সহায়তা সম্পর্কে আরো গভীর অনুশীলনের সহায়ক পরিবেশ পান তবে তা হবে এক নতুন সম্ভাবনা।

'আপনি একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করলেন'

মুক্তিনগর ইউনিয়নের 'খামার ধনারুহা ক্ষুধামুক্ত সমিতি'র এক গণগবেষণায় (২০০৫) প্রশ্ন রেখেছিলাম, যে গণসংগঠনগুলো আপনারা গড়ে তুলছেন, সেগুলো যাতে টেকসই হয় সেজন্যে কী পদক্ষেপ নেন? আমার ধারণা ছিল, একজন বাইরের সহায়ক হিসেবে এমন প্রশ্ন ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রশ্ন রাখামাত্র

[৯] অতো শব্দটি তিনি ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহার করেন। আলাপকালে মোমেনা বেগম বলেন, অতো লেখাপড়া শিখে এই সহজ কাজগুলোই যদি না বোঝেন, তবে আর আমাদের সাথে আপনাদের পার্থক্য কী?

কয়েকজন গণগবেষক এমনভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তাতে আমি খুবই লজ্জায় পড়েছিলাম। তারা কোনরকম রাখঢাক না করেই বললেন, এটা তো আপনি একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করলেন। টেকসই-এর প্রশ্ন কেন আসছে? সবই তো আমাদের – সঞ্চয়, সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, সবকিছুই। এসব নিয়ে আমাদের স্বার্থ-চিন্তা আছে। আর কোলকোন্দের গণগবেষকরা বিস্ময় নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন (২০০৬), আমাদের গড়া সংগঠন টেকসই হবে না কেন, ভাঙ্গার প্রশ্ন কেন আসছে? তাদের বক্তব্য – গণসংগঠনে সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবেই – গণসংগঠনে ভাঙ্গনও ধরতে পারে, সবাই মিলে আলোচনা করে তা ঠিক করবো। এর জন্য আবার চিন্তা কিসের?

এই লজ্জা পরবর্তীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে আরো সতর্ক হতে সাহায্য করে। শিক্ষা হয়েছে – বাইরের সহায়ক যতো আন্তরিকই হোক না কেন, গণগবেষণায় তিনিও কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারেন। এ পরিস্থিতি সেখানেই বেশি সৃষ্টি হয়, যেখানে গণগবেষকদের মুক্তচিন্তা করার পরিবেশ বেশি থাকে। কোন গণসংগঠন কখনই টেকসই হবে না, যদি না সেই গণসংগঠনে গণগবেষকদের মধ্যে এমন মুক্তচিন্তা, যৌথচিন্তা এবং এর ওপর পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং এর চর্চা অব্যাহত না থাকে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আরো **স্পষ্ট ধারণা** হয়েছে যে, এনজিওরা হতদরিদ্র মানুষের এই মালিকানা সত্যিকার অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হোক, এ প্রশ্নে বরাবরই উদাসীন থেকেছে। অথচ, টেকসই বিষয়টি নিয়ে এনজিওদের কত উদ্বেগ এর একটি কারণ সম্ভবত – টেকসই বিষয়টি তাদের কাছে যতোটা না হতদরিদ্রদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য জরুরী, তারো চেয়ে বেশি জরুরী তাদের রিপোর্ট তৈরি ও আলোচনার জন্য।

'আমরা আর চড়া সুদে ক্ষুদ্রঋণ নেই না'

প্রতিটি গণসংগঠনেই সঞ্চয় করা হয়। এই সঞ্চয়ের অর্থ থেকে ঋণ নিয়ে হতদরিদ্র নারী-পুরুষরা 'নিজেদের সঞ্চিত অর্থ' ব্যবহারের স্বাদ পেয়েছেন। সঞ্চয়ের পরিমাণ, সঞ্চয় দেবার সময়, সঞ্চয় থেকে ঋণ নেবার ও তা ফেরত দেবার শর্ত, কত লাভ দিতে হবে প্রভৃতি বিষয় যৌথভাবে আলোচনা করেই ঠিক করা হয়। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো – সঞ্চয় থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি। বেশিরভাগ সময় একইসাথে একাধিক ব্যক্তি ঋণের চাহিদা জানান। ঋণের পরিমাণ যাই হোক না কেন, কাকে ঋণ দেয়া হবে এজন্য সমবেত আলোচনা হয়। সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করা হয়, সত্যিকার অর্থে কার আগে ঋণ দরকার। ঋণ কে আগে পাবে সে ব্যাপারে কোন সুপারিশ এ প্রক্রিয়ায় কাজ করে না। ঋণের চাহিদা যিনি দিয়েছেন, তিনি ঋণ নিয়ে যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা যথার্থ হয়েছে কি-না, তা নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করা হয়। এর ফলে কেউই ঋণ নিয়ে তা বিনিয়োগ করে লোকসানের মুখোমুখী হন না। ঋণ যিনিই নিন না কেন, সে ঋণ যে ব্যবসাতেই বিনিয়োগ করুক না কেন, তাকে সফল করা যেন সকলের দায়িত্ব হয়ে ওঠে। যৌথচিন্তার মধ্য দিয়ে গণসংগঠনগুলোতে এমন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে – সেখানে যতো ছোট সিদ্ধান্তই হোক, তার ওপর সকলে মিলে আলাপ আলোচনা করেন, সেখানে একক সিদ্ধান্তের কোন সুযোগই নেই। শক্তিশালী এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই হতদরিদ্র মানুষগুলো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন, আমরা আর চড়া সুদে ক্ষুদ্রঋণ নেই না। আর কখনো নেবোও না।

সঞ্চয়ের অর্থ নিজেরা ব্যবহার করা সম্পর্কে হতদরিদ্রদের বক্তব্য হলো – নিজেদের টাকা দিয়ে নিজেরা ইচ্ছামতো ব্যবসা করি, আর কারো কাছে হাত পাততে হয় না। কেউ আর কিস্তি নেবার নাম করে অপমান করতে আসার সাহস পাবে না। এই সেল্ফ-হেল্প-ক্রেডিট করার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্ররা পূর্বের তুলনায় তাদের আয় বাড়িয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন আত্মকর্মসংস্থান। তবে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে আত্মবিশ্বাস।

এই আত্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে একক ও যৌথ উদ্যোগে আরো বেশি অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। এই সেল্ফ-হেল্প-ক্রেডিট এর ফলে ওই সকল এলাকার এনজিওদের চড়া সুদে ক্ষুদ্রঋণ নেবার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে। গণগবেষকরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন যে, কোন কোন এলাকায় তারা বলতে শুরু করেছেন – 'আমরা এলাকা থেকে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা বন্ধ করে দেবো'। কেবল ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা বন্ধ করার প্রশ্ন আসছে কেন? গণগবেষণার বিষয় হওয়া উচিত – এনজিওদের স্বচ্ছতা – এ স্বচ্ছতা কেবল যে সরকারের কাছে দাবি করার বিষয় তা তো নয়, গণগবেষণায় এ নিয়ে তোলপাড় করা দরকার।

কোদাল দিবস উদযাপন

কোলকোন্দে সামাজিক উদ্যোগ বিশেষ করে স্বেচ্ছাশ্রমের একটি দৃষ্টান্ত হলো কোদাল দিবস উদযাপন। কোদাল দিবস অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর একবার, এ বছর হয় উদ্যোগ মেলার দিনে।[১০] এ উপলক্ষে কোলকোন্দ ইউনিয়নের তিন শতাধিক নারী-পুরুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মাটি কেটে একাধিক রাস্তা সংস্কার করেন। গণগবেষক, উজ্জীবক, সাধারণ গ্রামবাসী সবাই কোদাল ও টুকরি নিয়ে এসে মাটি কাটায় অংশ

[১০] কোলকোন্দ ইউনিয়নের গণগবেষকগণ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা একটি স্থানীয় পর্যায়ে মেলার আয়োজন করবেন। মেলার নাম নির্ধারণ করলেন 'কোলকোন্দ স্থানীয় উদ্যোগ মেলা ২০০৭' সংক্ষেপে 'উদ্যোগ মেলা'। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, রংপুরের গঙ্গাচড়া থানার কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে। মেলাটি ছিল একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। দৃষ্টান্তমূলক এ কারণে, এই মেলায় একইসাথে ঘটেছে 'সমন্বয়, জবাবদিহিতা ও অনুপ্রেরণা'-র সমাহার। প্রত্যাশার সাথে অর্জন মিলিয়ে নিতে গণগবেষকরা মেলা-পরবর্তী পর্যালোচনায় বসেন। তাতে বেড়িয়ে আসে যেমন নতুন একাধিক সফলতা ও সম্ভাবনাময় দিক, তেমনি চিহ্নিত হয় একাধিক দুর্বলতা ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। উদ্যোগ মেলার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় – কোলকোন্দ ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত সকল সহায়ক শক্তির সুসমন্বয় ঘটানো।' গণগবেষক, উজ্জীবকরা আরো বলেন, 'এ মেলার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অগ্রগতিও উদযাপন করব'। সিদ্ধান্ত হয় মেলার আয়োজক হবে গণগবেষক, উজ্জীবক ও কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদ। পরবর্তীতে অবশ্য স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয় আয়োজন প্রক্রিয়ায়। এ মেলা দেখতে আসেন আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ১,০০০ এর বেশি সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এবং অতিথি হিসেবে ২০ জনের অধিক সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, গবেষক ও সাংবাদিক।

'এতো সেবা আমাদের জন্য!' গণগবেষক ও উজ্জীবকদের বিশেষ জানার আগ্রহ ছিল সরকারী সেবা দপ্তরগুলোর কী সেবা রয়েছে এবং তা সহজে পাবার উপায় কী? অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকারী একটি সেবা দপ্তর তুলে ধরে তারা কী করছে আর কী তাদের সেবা রয়েছে। তাদের বর্ণনা শুনে গণগবেষকরা বিস্ময় প্রকাশ করে জানান – 'এতো সেবা আমাদের জন্য'! গণগবেষকদের বিস্ময় দেখে উপস্থিত জেলা প্রশাসক নিজেও বিস্মিত হয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে এতো সমন্বয়হীনতা! এতো প্রশ্ন করেও গণগবেষকদের ক্ষোভ যে মেটে নি তার আভাস পাওয়া গেল পর্যালোচনা সভায়। এখানে গণগবেষকরা আত্মসমালোচনা করে বলেন, 'আমাদের আরো কৌশলী প্রশ্ন করা উচিত ছিল যাতে অন্যরা গুরুত্ব অনুভব করতো – আমাদের (জনগণের) কাছে জবাবদিহি করাটা তাদের একটি দায়িত্ব। তাছাড়া তারা কী করবেন এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপই হয় নি। আমরাও এ নিয়ে তেমন প্রশ্ন তুলি নি। এটা আমাদের একটি বড় দুর্বলতা ছিল।'

জেলা প্রশাসক মন্তব্য করেন – মেলা সম্পর্কে আমার ধারণাই পাল্টে গেল। এই মেলার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো 'স্বীকৃতি'। নিজের কাজের স্বীকৃতি নিজেদের কাছ থেকে। স্বীকৃতি অন্য কারো কাছ থেকে পাবার অপেক্ষা ছিল না এখানে। গণগবেষক আর উজ্জীবকরা তাদের নিজেদের পরিবর্তনের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছেন। এটা খুবই শক্তিশালী একটি দিক। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'জবাবদিহিতা'। এখানে সমন্বয় ঘটেছে, আমার মনে হয় এখন জবাবদিহিতাও হবে। আমাদের সর্বত্রই সমন্বয়ের অভাব, আমরা ছকে আটকে গেছি। ছকের মধ্য থেকে আসলে 'জনগণ' এর পরিবর্তে 'দাতাদের'ই ক্ষমতায়িত করা হয়। জেলা প্রশাসকের এই বক্তব্যকে 'নতুন সুযোগ সৃষ্টি হলো' বিবেচনা করছেন গণগবেষকরা।

সরকারী সেবা দপ্তরগুলো জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য – উদ্যোগ মেলার ফলে এর একটি প্রাথমিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো। সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষরা তো এতদিন জানতেনই না তাঁদের কী সেবা, কখন ও কিভাবে পাবার কথা। গণগবেষকরা বলেছেন, এখন আমরা গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, ন্যায্য প্রশ্ন করবো, কিসের ভয়, প্রশ্ন করা আমাদের অধিকার। অলসতা করলে জানতে চাইব – এত সময় লাগছে কেন? প্রশ্ন এখন আমরা চেয়ারম্যানকেও করব। গণগবেষকদের মতে, দায়িত্ব থাকলে জবাবদিহিতা থাকতেই হবে। এই যে তাদের অধিকার-সচেতনতা, এটাই হলো নতুন সম্ভাবনা, নতুন শক্তি। এ শক্তির বলে প্রচলিতভাবে বিবেচিত **হতদরিদ্র মানুষটিরও ক্ষমতা কাঠামোকে প্রশ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হলো।**

নেন। চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল জানান, স্থানীয় একটি প্রশস্ত রাস্তা, ছোট আরো দু'টি রাস্তা সকলের স্বেচ্ছাশ্রমে আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করি।[১১] এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাশ্রয় হয় প্রায় ১০০,০০০ টাকা। অনেকে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন, যাঁদের আসলেই স্বেচ্ছাশ্রম (সময়) দেবার সামর্থ্য ছিল না। পরে আলাপ করে জানা যায়, এ ধরনের আরো অনেকে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারেন নি, সে জন্যে তাঁরা এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁদের শ্রম বিক্রি করতে অনেক দূরে যেতে হয়। তারপরেও যাঁরা এসেছিলেন তারা দ্রুত (সাধ্যমতো সময় দিয়ে) চলে গেছেন। অনেক নারী স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তারা পুরুষের বাধার কারণে এ কাজে যুক্ত হতে পারেন নি। হাইস্কুলের এক শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন, 'আমার ছাত্রী তিথি আমাকে বারবার অনুরোধ করেছে, আমি তার বড় ভাইকে বোঝাই যেন তাকে মাটি কাটতে যেতে দেয়। তিথিকে আমি স্বেচ্ছাশ্রম দেবার সুযোগ করে দিতে পারি নি, এ জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।' এর পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে হয় বলা যায়, 'কোদাল দিবস' উদযাপন কেবল স্বেচ্ছাশ্রম দেয়া নয়, তা এক আনন্দের, এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সে কারণেই স্বত:স্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত বেড়িয়ে এসেছে 'আমরা এখন থেকে প্রতি বছরই কোদাল দিবস উদযাপন করব'।

এই সফলতা, দৃষ্টান্ত ও আনন্দের মধ্যে বেদনাও ছিল। জানালেন গণগবেষক নুরুজ্জামান – 'কোদাল দিবস আমাদের জন্য একটি আনন্দের দিন, কারণ এতে সবাই স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে। আমরা সবাইকে স্বেচ্ছাশ্রমে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছি। কিন্তু এবার আনন্দের সাথে একটি বেদনাও যুক্ত হয়েছে। শুধু বেদনা নয়, তা আমাদের জন্য একটি দুর্বলতাও বটে। এ দুর্বলতার কারণ হলো কয়েকজন ইউপি মেম্বর। তারা তাদের 'পকেটের' কিছু মানুষকে মাটি কাটতে আসতে বলেছিলেন। এ সংখ্যা সবমিলিয়ে ১৮-২০ জনের মতো ছিল। যাদের আসলে স্বেচ্ছাশ্রম নয়, মাটি কাটতে আসতেই বলা হয়েছে। তারা রাস্তার একপাশে বসেছিলেন। কেন বসে আছেন জানতে চাইলে তারা জানান – কোথায় মাটি কাটব জানি না তো। সাথে সাথে আমরা বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানিয়ে বলি, আমাদের তো লোক বেশি দেখাবার দরকার নেই। মেম্বরদের কাছেও আমরা জানতে চাই – এটা আপনারা কেন করলেন? এটা অন্যায়। এটা গণগবেষণার সাথে বেমানান। তাছাড়া এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ততো আমরা নেই নি। মেম্বররাসহ এতে চেয়ারম্যান নিজেও বিব্রত বোধ করেন। ভুল বুঝতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত ১৮ জনকে মাটি কাটতে নিষেধ করেন। অবশ্য তারা তখনও পর্যন্ত মাটি কাটা শুরু করেন নি। পরে তারা ফিরে যান। এখানে যে **শিক্ষাটি** নেবার মতো তা হলো, যৌথচিন্তার সাথে সম্পৃক্ত থেকেও, অনেকে তার স্বভাবসুলভ আচরণ পাল্টাতে পারেন না, যা অনেক সময় যৌথচিন্তাবিরোধী হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক ছোট ঘটনার জন্যেও বড় ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে'।

'চেয়ারম্যান বলেন – উজ্জীবকরা, গণগবেষকরা যা করছেন, এসব আমাদের কাজ, তাদের শক্তি মানে আমাদের শক্তি'

কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একজন উজ্জীবক। উজ্জীবক হিসেবে তিনি সক্রিয়। তিনি বলেন, 'আমি মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, উজ্জীবক ও গণগবেষকদের সকল ভাবনা, সকল কাজ ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নকে ঘিরেই।' 'শুধু তাই নয়', 'চেয়ারম্যান বলেন – উজ্জীবক ও গণগবেষকরা যা করছেন, এসব আমাদের কাজ, তাদের শক্তি মানে আমাদের শক্তি।'

---

১১ আংশিক সংস্কার করা হয়েছে। কারণ শুধু মাটি কেটে রাস্তায় ফেললেই তাকে পূর্ণ সংস্কার বলা যায় না।

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গণগবেষকরা যতো সংগঠিতই হোক, আর তাদের সক্রিয়তা যতো তীব্রই হোক না কেন, ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় ও স্বয়ংক্রিয় সম্পৃক্ততা ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ 'গণজাগরণ' এগিয়ে নেয়া কঠিন। উদ্যোগ মেলা আয়োজনে তার প্রমাণ মিলেছে। ইউনিয়ন পরিষদ সম্পৃক্ত ছিল বলে এবং চেয়ারম্যান নিজে মেলা আয়োজনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন বলে, জেলা প্রশাসন ও সরকারী সেবা দপ্তরসমূহ সম্পৃক্ত হয়েছে দ্রুত। ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ উদ্যোগ মেলায় জেলা প্রশাসককে উপস্থিত করতে কত সময় যে ব্যয় হতো, কিংবা আদৌ তা সম্ভব হতো কি-না, তা বলা যায় না। আর সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তো মনেই করে নি, এ ধরনের গণউদ্যোগে তাদের অংশগ্রহণ জরুরী। উল্টো চেয়ারম্যানের কাছে তারা যাতায়াত ব্যয় চেয়েছিল। চেয়ারম্যানও উল্টো তাদের বলেছেন, 'আপনাদের টাকা দিতে হলে তো আমাকে চাঁদাবাজী করতে হবে'। মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী না হলে তিনি হয়তো এমন স্পষ্ট কথা বলতে পারতেন না। এসব কথা তিনি যেমন জেলা প্রশাসককে বলেছেন, তেমনি বলেছেন সমন্বয় সভাগুলোতেও। উদ্যোগ মেলাকে ঘিরে কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদের এই সক্রিয়তা ও সফলতা অন্যান্য এলাকার গণগবেষকদের মধ্যে এখন একটি নতুন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে।

গণগবেষণা – পরিবর্তনের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার

গণগবেষণা কর্মশালার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে যৌথচিন্তার যে চর্চা শুরু হয় এবং তার ফলে আত্মশক্তির যে প্রকাশ ঘটতে শুরু করে, তা আরো গতি পায় গণসংগঠন গড়ে ওঠার পর। গণসংগঠনে হতদরিদ্রদের যৌথচিন্তা যেমন একদিকে সুসংহত হয় তেমনি তা এক বিশেষ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। হতদরিদ্রদের এই শক্তি অনুধাবন করা যায় তাদের খোলামেলা সংলাপে – আগে যে সমস্যা সমাধান করতাম সাত দিনে, এখন তা করি এক দিনে। এখন আর আমরা শুধু গায়ের শক্তি নিয়ে চলি না, আমাদের অর্থ আছে, আমরা এখন একসাথে চিন্তা করি, একসাথে সিদ্ধান্ত নেই। এখন আমাদের মনের শক্তি অনেক – এ শক্তি ভোটের শক্তির চেয়েও বেশি। এই শক্তির বলেই গণগবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন – বড় পরিবর্তনের জন্য দরকার বড় শক্তি, আর বড় শক্তির জন্য দরকার বড় সংগঠন কারণ বড় পরিবর্তনে রয়েছে বড় বাধা। কিন্তু এই বড় বাধাটি কোথায় – এই বাধা যে পুরো সিস্টেম বদলানো – গণগবেষণায় কিন্তু বিষয়টি এখনো পুরোপুরি আসে নি। তবে গণগবেষণার সংলাপে দেখা যায়, হতদরিদ্র মানুষের বঞ্চিত হবার কারণগুলি বেড়িয়ে এলে, বঞ্চনার বিদ্যমান পরিণতিগুলি তাদের উপলব্ধিতে আঘাত হানতে শুরু করে এবং এ আঘাত প্রতিবাদের ঝড় তোলে। আর এ ঝড় পর্যায়ক্রমে নিজেদের ভিতর তীব্র হতে থাকে। এখান থেকেই তৈরি হয় নিজেদের আরো সুসংহত করার তাগিদ। এ তাগিদ থেকেই ধাপে ধাপে গণগবেষণা হতদরিদ্রদের পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগঠিত হবার একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠছে, এবং ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, গণগবেষণা সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ক্ষমতা সুসংহত এবং কার্যকর প্রয়োগের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এবং বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোতে এই people's power হবে countervailing power।

শক্তির উৎস – হতদরিদ্র মানুষের অনুসন্ধান

গণগবেষণার এতো যে শক্তি – তার উৎস হলো মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা এবং মানুষের সামর্থ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। পাওলো ফ্রেইরীর অভিজ্ঞতায় এমন উঁচু ধারণার বহু উদাহরণ মেলে – যেমন, তানজিনিয়ার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন '... to invite people to believe in themselves. It should invite people to believe that they have knowledge. The people must be challenged to discover their historical existence through the critical analysis of their cultural production: their art and their music'. হতদরিদ্র মানুষরাও যে অসীম সামর্থ্যবান, এর প্রমাণ মেলে যখন তারা

স্বাধীনভাবে যৌথচিন্তায় অংশ নেন। হতদরিদ্র নারী-পুরুষরা গণগবেষণা করে এতো যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, এতো যে দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছেন – যৌথচিন্তার মধ্য দিয়ে নিজেদের শাণিত করতে পেরেছেন বলেই এসব সম্ভব হয়েছে – এই শাণিত হবার বীজ রোপণ হয় গণগবেষণা কর্মশালায়। এই কর্মশালায় হতদরিদ্র নারী-পুরুষ আবিষ্কার করেন – মানুষ হিসেবে তারা কতো সামর্থ্যবান! এবং তারা একটি বিশেষ শক্তি উপলব্ধি করেন – যে শক্তির জোরে একজন হতদরিদ্র ও বঞ্চিত নারী সহজেই বলে ওঠেন – মানুষ হিসেবে এ দুনিয়ায় আমার অনেক অধিকার। কর্মশালায় এ অধিকার এবং তা কিভাবে অর্জন করা যায় – এ ধরনের প্রশ্ন সামনে রেখেই এগোতে থাকেন। সেখানে তৈরি হয় একের পর এক প্রশ্ন এবং উত্তর এবং আবারো প্রশ্ন। এই প্রশ্ন ও উত্তর দুটোই থাকে সকলের নিয়ন্ত্রণে। কর্মশালায় একজন সহায়ক থাকেন বটে, তবে তার একমাত্র কাজ হলো, যাতে আরো প্রশ্ন উঠে আসে সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখা। তিনি কোনভাবেই উত্তরদাতা নন, তবে বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করেন। মানুষের শক্তি-সামর্থ্য, অধিকার এবং অধিকার আদায়ের পথ আবিষ্কার করতে হতদরিদ্র নারী-পুরুষরা যে ধরনের মিথস্ক্রিয়া করেন, স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য তার খন্ডিতাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

মানুষ কে?

'মানুষ কে' এ আলোচনা শুরু হলে চিন্তার ঝড় ওঠে। মানুষ কে – এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য, সৃজনশীলতা, বিবেক, সম্মান, মর্যাদা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা একটু এগোলেই প্রশ্ন আসে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কী? উত্তর আসে – মানুষ চিন্তা করতে পারে, প্রাণীরা পারে না। মানুষ সৃজন করতে পারে, অন্য প্রাণী পারে না। উল্টো প্রশ্নও আসে – তাহলে বাবুই পাখির বাসা বানানোটা কি চিন্তা করার কাজ নয়? আবার আলোচনার ঝড় ওঠে। না, বাবুই পাখির বাসা বানানোটা সৃজনশীলতা নয়, ওটা সহজাত প্রবৃত্তি। পাখির এই সৃষ্টি প্রাকৃতিক, জৈবিক প্রয়োজনে, নেহাতই বাঁচার তাগিদে। তাই এই সৃষ্টির ধরন ২০ বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই। কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করে সচেতনভাবে। মানুষের সৃষ্টির রূপান্তর ঘটে। মানুষের চিন্তা করার সাথে পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে এবং এর সাথে আছে আবার স্বপ্ন দেখার সম্পর্ক। এর ধারাবাহিকতায় আলোচনা চলে আসে মানুষের সামর্থ্য প্রসঙ্গে। প্রশ্ন ওঠে – মানুষ কি শেখাতে পারে? প্রথমে সবাই বলে, শেখাতে পারে। কেউ জোর দিয়ে বলেন, অবশ্যই শেখাতে পারে। কোন শক্তির বলে মানুষ শেখাতে পারে? প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয় – মানুষ শেখাতে পারে, কারণ তার বুদ্ধি আছে।

তখন প্রশ্ন ওঠে তাহলে **বুদ্ধি** কী? বুদ্ধি মানুষের একটি শক্তি। একটি বিশেষ সামর্থ্য। এ সামর্থ্য বাড়ানো যায়। প্রশ্ন আসে – বুদ্ধিকে সামর্থ্য বলা হচ্ছে কেন? কারণ আমরা দেখি, একই পরিবেশে থেকেও কারো বুদ্ধি কম, কারো বেশি। তাহলে কিভাবে বুদ্ধি বাড়ানো যায়? সামর্থ্য বাড়াতে ইচ্ছা থাকতে হয়। তবে ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। চেষ্টাও করতে হবে – অর্থাৎ অনুশীলন করে বুদ্ধি বাড়ানো সম্ভব। অনুশীলন যতো বেশি হবে, ততো সামর্থ্যও বাড়বে, বুদ্ধি ততো তীক্ষ্ণ হবে। এরপর আর কোন পাল্টা ব্যাখ্যা থাকে না। ফলে সবাই আপাতত একমত হতে বাধ্য হন – বুদ্ধি মানুষের একটি সামর্থ্য। এবং এই সামর্থ্য সকলের সমান। অনুশীলনের মাধ্যমে তার তারতম্য ঘটানো সম্ভব।

আবার প্রশ্ন আসে, বুদ্ধি যদি সামর্থ্য হয়, তবে **জ্ঞান** কী? এ ধরনের আলোচনা সধারণত হয়ে ওঠে কৌতুহলপূর্ণ। কিন্তু দ্রুত এগোনো যায় না। আলোচনা নানা শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। কেউ বলেন, বুদ্ধিটাই জ্ঞান। কেউ বলেন, অজানাকে জানা, নতুন কিছু শেখাই জ্ঞান। কারো মতে, পরিপূর্ণভাবে কোনো কিছুকে জানাই জ্ঞান। প্রশ্ন ওঠে, সব জানাই কি তাহলে জ্ঞান? কারো মতে, সব জানাই জ্ঞান, কারো মতে তা নয়।

তর্ক ফের জমে ওঠে। চলে অনেকক্ষণ। আংশিক সমাধান হয় এভাবে – বই বা খবরের কাগজ পড়ে যা জানা যায় তা কেবলমাত্র 'তথ্য' – এমন তথ্য নানাভাবে জানা সম্ভব। প্রশ্ন আসে, তাহলে শেখা কী? আবার আলোচনা গভীরে যায়। জানাটাই শেখা নয়, জানার সাথে অনুশীলন যোগ হলে তবেই তা শেখা হয়। অনুশীলন ছাড়া শেখা অসম্ভব। অর্থাৎ **শেখা = জানা + অনুশীলন**। একজন উদাহরণ দেন – সাঁতারের বই পড়ে সাঁতার সম্পর্কে 'জানা' যায় মাত্র। সত্যিকার অর্থে সাঁতার শিখতে হলে পুকুরে নেমে 'জানা' অনুযায়ী অবশ্যই চেষ্টা বা অনুশীলন করতে হবে। অনেকে রসিকতা করে বলেন, সাঁতার শেখার জন্য সাঁতারের বই পড়ে নদীতে ঝাঁপ দিলে বিপদই আছে। অনুশীলন করে শেখাটাই কি তাহলে জ্ঞান? বুদ্ধি খাটিয়ে, গভীর অনুশীলন করে কোন বিষয়ে নতুন উপলব্ধিতে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই জ্ঞান যা সত্য। যে সত্য পরীক্ষিত, যৌক্তিক। এভাবে চলতে চলতে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয় এভাবে – বস্তুই জ্ঞানের উৎস।

তর্ক-বিতর্কের এ পর্যায়ে আবারো আগের ইস্যু উঠে আসে – **তাহলে মানুষ কি শেখাতে পারে?** বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এবার উত্তর বেড়িয়ে আসে – না, মানুষ শেখাতে পারে না। কারণ, শিখতে হলে অনুশীলন অনিবার্য। যে শিখবে তার ভূমিকাই এখানে প্রধান। অন্য একজন সর্বোচ্চ সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। ফলে সিদ্ধান্ত বেড়িয়ে আসে – মানুষ নিজে শিখতে পারে, শেখাতে পারে না। তবে শিখতে সহায়তা করতে পারে। প্রশ্ন ওঠে, মানুষ যে জ্ঞানের অহংকার করে, বলে যে – কম জ্ঞানী, বেশি জ্ঞানী, এসব তো তাহলে মিথ্যা? অবশ্যই মিথ্যা। কারণ, জ্ঞান দান করার বিষয় নয়। প্রতিটি মানুষই জ্ঞানী। যে যার কাজ ও অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানী। যার যতো অনুশীলন, তার ততো বেশি উপলব্ধি, তার ততো বেশি জ্ঞান। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যও ব্যবহার করা হয় এসব আলোচনায়। প্রাণীর তুলনায় মানুষ যে বেশি চিন্তা করতে পারে, তার কারণ মানুষের মগজের পরিমাণ বেশি – ১৩০০ থেকে ১৯০০ মি.মি. পর্যন্ত। অন্য প্রাণীর মগজের পরিমাণ তার শরীরের অনুপাতে বেশ কম। ফলে আবারো সিদ্ধান্ত – যতো অনুশীলন ততো জ্ঞান।

মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন – মানুষ সৃজনশীল প্রাণী। সৃজনশীল প্রাণী বলেই মানুষ অন্য প্রাণী থেকে আলাদা হতে পেরেছে। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী – তার সামর্থ্য অসীম। অনুশীলন করে এই বুদ্ধি অর্থাৎ সামর্থ্যকে আরো শাণিত করা সম্ভব। এই সামর্থ্য সকল মানুষেরই সমান। জ্ঞান হলো মানুষের সত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার এক গভীর উপলব্ধি। জ্ঞান দান করার বিষয় নয় – দান করা যায়ও না। আসলে সবাই জ্ঞানী – শুধু তাই নয়, প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ পেশায় সর্বোচ্চ জ্ঞানী। অনুশীলনটা এখানেও মুখ্য। মানুষ নিজে শেখেন অনুশীলন করেন – তাই মানুষ অন্যকে শেখাতে পারে না – এটা অসম্ভব। যারা গণগবেষণা করেন – মানুষ সম্পর্কে এমন উঁচু ধারণা নিয়েই 'পরিবর্তন'-এর জন্য তারা এগোতে শুরু করেন।

সহায়ক 'হয়ে ওঠা' এবং সহায়ক 'টিকিয়ে রাখা'

মানুষের সামর্থ্যের সূত্র ধরেই গণগবেষণায় সহায়ক অন্যতম আর একটি শক্তির উৎস। সহায়ক হয়ে ওঠা এবং গণগবেষণায় তাদের সক্রিয়ভাবে টিকিয়ে রাখা কেবল গভীর অনুশীলনের বিষয়ই নয়, একটি সময়সাপেক্ষ ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও বটে। আর এ প্রক্রিয়ার ভিত্তিভূমি হলো – দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সারাদেশে স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবক। এই উজ্জীবকদের মধ্য থেকে সহায়ক গড়ে উঠছে দুই প্রক্রিয়ায় – গণগবেষণা কর্মশালা আর গণগবেষণা অনুশীলণের মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কর্মশালার মধ্য দিয়ে যারা সহায়ক হিসেবে গড়ে উঠছেন তারা সকলেই টিকে থাকতে পারছেন না। এর কিছু কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু গণগবেষণা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যারা সহায়ক হয়ে উঠছেন তারা অনেকাংশেই টেকসই হচ্ছেন – যদিও তাদের অনেকেই উজ্জীবক নন এবং তারা হতদরিদ্র শ্রেণীর। উজ্জীবক না হলেও এই নতুন সহায়করা স্বাধীনভাবে চিন্তা চর্চার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ চেতনা ধারণ করতে সক্ষম হন এবং তা ক্রমশই

একটি নতুন প্যাটার্নে পরিণত হচ্ছে। নতুন এ প্যাটার্ন চ্যালেঞ্জিং – প্রতিমুহূর্তে প্রতিকূলতা অতিক্রম করে করেই চলতে হয় সহায়কদের – বিদ্যমান সামাজিক চাপ এবং নিজের ভিতরের 'আমি' দ্বারা।

এই নতুন প্যাটার্নে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো স্বপ্ন নির্মাণ। স্বপ্ন নির্মাণের বিষয়টি কেবল সহায়কদের জন্যই নয়, গণগবেষণাসংশ্লিষ্ট সংস্থার জন্যও সত্য। কারণ সংস্থাটির স্বপ্ন নির্মাণের ওপর নির্ভর করছে – একদিন গণগবেষকরা সংগঠিত হয়ে প্রচলিত কাঠামো ভাঙ্গার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সংস্থাটি তখনও একইভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করে যাবে, ভয়ে পিছু হটবে না। সংস্থাটি এমন স্বপ্ন নির্মাণে সক্ষম হলে হতদরিদ্রদের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ 'দখল' করার যে কথা উঠেছে, তা অর্জন করা সহজ হবে। এটা না ঘটলে গণগবেষণায় হতদরিদ্রদের মাঝে নতুন শক্তি, নতুন চেতনা সৃষ্টি করেও 'সিস্টেম বদলানোর' স্বপ্ন কেবল কল্পনার বিষয়ই রয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিয়ত সে স্বপ্নকে বিকশিত করার প্রক্রিয়াকে অনুশীলন-চক্রে আবদ্ধ করা না গেলে কেবল কিছু পরিবর্তন করা অবশ্যই সম্ভব হবে, কিন্তু কাঠামোর বা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে না।

গণগবেষণায় সহায়কের ভূমিকা খুবই সতর্কতার। সহায়ককে প্রতিনিয়ত চোখ কান খোলা রাখতে হয়। গণগবেষণার বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রেই এর উদাহরণ দেয়া যায়। কোলকোন্দ ইউনিয়নের বিনবিনা চরবাসীর জীবনমরণ সমস্যা হলো নদী ভাঙ্গন এবং এর ফলে তাদের বাড়িঘর বিলীন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। প্রকৃতির সাথে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকার এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যে অভিজ্ঞতা তাই তো হবার কথা গণগবেষণার বিষয়। কিন্তু সেখানে গণগবেষণায় এ ধরনের বিষয় এসেছে অনেক দিন পরে। এখানে সহায়ক অগ্রসর হয়েছেন অন্যান্য এলাকার অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে। সহায়ক চেয়েছেন আলোচনা হোক – আরো কী সামাজিক উদ্যোগ নেয়া যায়, কী করে এখানে আরো সংগঠন গড়ে তোলা যায় প্রভৃতি। সাধারণত সহায়করা (নতুন বা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহায়ক) তার সুবিধামতো উদাহরণ দেন। কিন্তু চরে বহিরাগত সে সহায়ক দেখতেই পাচ্ছিলেন না যে, এখনই এ ধরনের নির্বাচিত বিষয়ের ওপর চরের স্থানীয় মানুষের আগ্রহ ও ধারণার গভীরতা কোনটাই তৈরি হয় নি। বরং সহায়কের ভূমিকা হবার কথা ছিল – হতদরিদ্রদের আগ্রহ কী করে নদী ভাঙ্গনের কারণ, এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতির ধরন, সরকারী সাপোর্ট কী আছে এবং কিভাবে এর একটা স্থায়ী সমাধান বের করা যায়, সেদিকে উদ্বুদ্ধ করা। তাই স্বাধীনভাবে চিন্তার সুযোগ থাকলেই যে সঠিকভাবে গণগবেষণার বিষয় নির্বাচন হবে – এমন কথা বলা যায় না। এর জন্য সহায়কেরই অনেক বেশি কৌতুহলী ভূমিকা পালন জরুরী – তার দায়িত্ব কেবল আলোচনা এগিয়ে নিতে সহায়তা করাই নয়। তিনি এমনভাবে সকলকে প্রভাবিত করবেন, যাতে হতদরিদ্ররা তাদের গণগবেষণায় চিন্তার নতুন বিষয় খুঁজে পান সহজেই।

চ্যালেঞ্জ – আরো নতুন সম্ভাবনার জন্য

এক. **কর্মকৌশলে পরিবর্তন অনিবার্য।** গত আড়াই বছর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কেবল নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি, মুখোমুখী হয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জেরও। সেসকল চ্যালেঞ্জের রেশ নির্মূল করা কঠিন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জটি হলো সংস্থাটির কর্মকৌশলে পরিবর্তন আনা এবং এরই সূত্র ধরে গণগবেষণা-সহায়তায় কর্মীদের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো। সংস্থাটির প্রত্যাশা হলো – একটি ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠন করা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা – একটি ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গঠন করা। এই প্রত্যাশা অর্জনে বাংলাদেশে কর্মকৌশল হলো – নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক গণজাগরণ গড়ে তোলা। সমাজের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের কথা কিন্তু এ কৌশলে উল্লেখ নেই। এদের অগ্রাধিকারের আওতায় না নিয়ে শুধু নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুধামুক্তির

গণজাগরণ কি আদৌ গড়ে তোলা সম্ভব? এ প্রশ্ন নিয়ে কর্মীদের মধ্যে সমালোচনা নেই বললেই চলে, অথচ যা অনিবার্য। অবশ্য এ কথা সত্য, গণজাগরণে সমাজের হতদরিদ্রদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই সংস্থাটি গণগবেষণা শুরু করেছে। কিন্তু গণগবেষণাকে সত্যিকারের গণজাগরণ গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার বিবেচনা করতে হলে কর্মকৌশলের ব্যাপক পুনর্গঠন জরুরী। অন্যথায়, গণগবেষণা করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন হবে, গণগবেষণা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হবে। অথচ, যেটি আসল কাজ – গণজাগরণে হতদরিদ্রদের সম্পৃক্ত করা তা হবে না, তাদের মালিকানা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা তো পরের কথা। গণগবেষণার মতো স্বাধীন ও প্রগতিশীল বিষয়কে এগিয়ে নিতে হলে কর্মীদের মধ্যে যে ধরনের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো দরকার তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক উদ্যোগ সংস্থাটিকে এখনই গ্রহণ করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

দুই. **সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার মতো অসুস্থ সংস্কৃতিঃ** দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একটি শক্তিশালী দিক হলো গণগবেষণা তারা নির্দিষ্ট সময় ধরে 'প্রজেক্ট' করার চেষ্টা করছে না। তারা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছে যে, দাতাদের টাকায় 'প্রজেক্ট' করে গণগবেষণা হবে না। এটা বুঝেই তারা স্বাধীনভাবে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়েই গণগবেষণা শুরু করেছে। এনজিওরা যেমনটা মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে চতুরতার সাথে সব কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখে দেয়, ফলে মানুষ স্বত:স্ফূর্ততা, স্বাধীনতার কথা বারে বারে শুনলেও ঠিক স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্টে হুবহু এ সংকট নেই, তবে গণগবেষণা-সহায়তায় কর্মীদের সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায়, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার এক অসুস্থ সংস্কৃতির চক্রে আটকে পড়তে পারে, যা কেবল সংস্থাটির জন্যই নয়, গণগবেষণার জন্য হবে ভয়ানক ঘটনা।

তিন. **বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্কঃ** প্রায় শতাধিক গণসংগঠনের কোন ব্যাংক হিসাব নেই। ব্যাংক হিসাব তারা খোলেন নি সমবেতভাবে আলোচনা করেই। তাদের যুক্তি দুটো – এক. সঞ্চিত অর্থ তাদের হতে পড়ে থাকে না – পুরোটাই বিনিয়োগ করা হয়। দুই. বিশ্বাস – সঞ্চয়ের অর্থ যতই হোক, তা গণসংগঠনের ক্যাশিয়ারের হাতেই থাকে। সকল হিসাব-নিকাশ তার দ্বারাই হয়, ক্যাশিয়ারের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। সদস্যদের যুক্তি – সবাই মিলে যাকে ঠিক করেছি, সে কখনোই বেঈমানী করতে পারে না, আর তাছাড়া বেঈমানী করে যাবে কোথায়। উল্লেখ্য, এখনো পর্যন্ত কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। (হয়তো আমরা নিজেরা সন্দেহপ্রবণ বলেই, মানুষকে বিশ্বাস করার সামর্থ্য রাখি না বলেই এমন করে ভাবছি।) তবুও আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, যদি অর্থ সংরক্ষণকারী অসুস্থ হন, তার বাড়ি থেকে যদি এই অর্থ চুরি যায়, যদি পুড়ে যায়, তখন কী করবেন? এ প্রশ্নে দেখা যায়, মতামত তিন ধরনের হয় – এক. অধিকাংশরাই বলেন, আসলে এটা একটা চিন্তার বিষয়। দুই. না, এমন হবে না, আল্লাহ আছেন আমাদের সাথে। এবং তিন. যেভাবেই হোক তাকে (ক্যাশিয়ার) টাকার হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। ক্যাশিয়ারদের মন্তব্য জানতে চাইলে তাদের অনেকেই জানান, এই ঝুঁকি আমি নেব না, 'এতো যে ঝামেলা আছে এটাতো চিন্তা করি নি আগে'। বিশ্বাস প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বাসকে যুক্তির আলোকে না দেখলে, এমন অনেক নেতাই ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়ায় ঢুকে যেতে পারেন, যার দ্বারা প্রতারণার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

চার. **নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সংকটঃ** এই বিশ্বাস দেখা যায়, নির্বাচিত নেতার মেয়াদ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও। এখনো অধিকাংশ গণসংগঠনে নির্বাচিত নেতার কোন মেয়াদকাল স্থির করা হয় না। আরো নতুন নেতা সৃষ্টি হবে কিভাবে – এ প্রশ্ন উঠলে খানিকটা এড়িয়ে উত্তর আসে, ওনার দায়িত্ব শেষ হলেই আর

একজন দায়িত্ব নেবেন। ওনার দায়িত্ব শেষ হবে কবে – এ প্রশ্নের উত্তরও আসে, উনি দায়িত্ব নিয়ে হেলাফেলা করামাত্রই। সংগঠন বিরোধী কোন কাজ করলেই আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেব। তার মানে ওনার সবকিছু ঠিক থাকলে সারাজীবনই সভাপতি বা সম্পাদক থেকে যেতে পারবেন। এই কথা কেউ বলেন না যে, ওনার দায়িত্ব ছয় মাসের বা এক বছরের জন্য। নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি – বিষয়টি গণগবেষণায় সিরিয়াসলি না এলে, এ নিয়ে তিব্র বিতর্ক না হলে, প্রচলিতভাবে নেতৃত্ব থেকে টার্ণ করে ক্ষমতা চর্চার যে সংস্কৃতি বিদ্যমান, তা থেকে বেড়িয়ে আসা সহজ হবে না। বিষয়টি নিয়ে হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীদের মধ্যেই বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা হওয়া দরকার। নেতৃত্ব বিকাশের প্রশ্নে আরো বড় চ্যালেঞ্জ হলো, গণসংগঠনগুলোতে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন একটি প্যাটার্ন গড়ে তোলা – যাতে করে সকল পর্যায়ে সব সময়ে নেতৃত্ব হতদরিদ্রদের মাঝ থেকে নির্বাচিত হয়। এমন একটি নতুন প্যাটার্ন জরুরী এজন্যে যে, অনেক সময় হতদরিদ্ররা তাদের অন্ধ বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, কিংবা তাদের (শোষিত) দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজের অগ্রসরদের কারো হাতেই নেতৃত্ব সঁপে দিতে চান। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে নেতৃত্ব হতদরিদ্রদের হাতে থাকলেও এই দুর্বলতার কারণে সমাজের এগিয়ে থাকা শ্রেণীর হাতে গণসংগঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি প্যাটার্ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়করা গণসংগঠনের নেতাদের প্রতি এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেন – আপনারা অন্যদের বিশেষ করে কম বয়সীদের প্রতি আহবান করুন কারা দায়িত্ব নিতে আগ্রহী – দায়িত্ব নিতে তারা যাতে করে উৎসাহিত হয় সেজন্যে তাদের কারো কারো ওপর পরীক্ষামূলকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের (হতে পারে এক মাস/তিন মাস) জন্য দায়িত্ব দিন। শুধু সহায়কদের জন্যই নয়, যারা ভবিষ্যতে গণগবেষণা চর্চায় আগ্রহী – বিষয়টি নিয়ে তাদের গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।

পাঁচ. **বড় স্বপ্ন নির্মাণে ঘাটতিঃ** গণগবেষণা-সহায়কদের জন্য আর একটি চ্যালেঞ্জ বেড়িয়ে আসে ২৮ মে ২০০৭, মুক্তিনগরে গণগবেষক দলের নেতাদের আলোচনায়। এখানেও অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে নেতারা ব্যাখ্যা করতে থাকেন – আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করি – আমরা প্রতিবাদী – আমরা প্রতিবাদ করি অনেকের স্বার্থ একসাথে রক্ষার জন্য – আমরা গণগবেষণার মধ্য দিয়ে এ কাজ চালিয়ে যাবো। তাদের বক্তব্যের এক পর্যায়ে আনিসুর রহমান প্রশ্ন তোলেন – আপনারা বলছেন ইউনিয়ন পরিষদ সক্রিয় নয় বলে, তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না বলে মানুষ অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন – তাহলে আপনারাই ইউনিয়ন পরিষদ দখল করে নিন না কেন? আপনাদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ চললে তো আর কোন বাধা থাকার কথা নয়। কঠিন প্রশ্ন। প্রথমে উত্তর এলো – না। পরে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন, ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব নিলে খারাপ হতে হয় – ওইসকল খারাপ লোকের প্রভাবে আমরাও খারাপ হয়ে যাবো – তাই আমরা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব নেব না। এবার আনিসুর রহমান সমালোচনা করে প্রশ্ন তুললেন – তাহলে এ আপনাদের কেমন শক্তি যে দায়িত্ব নিতে ভয় পান? যদিও ভরতখালির মোমেনা বেগম বলেন যে, আমি দায়িত্ব নেব, আমি সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করছি – আমি ভয় পাই না। গণগবেষণা-সহায়কদের জন্য চ্যালেঞ্জের জায়গাটি হলো – এখানে গণগবেষক দলের নেতাদের মধ্যে স্বপ্ন নির্মাণে সহায়তা করা, তাদের মধ্যে অতো বড় স্বপ্নই নির্মাণ হয় নি। ফলে অতদূর তারা দেখতেই পাচ্ছেন না। কিন্তু এই স্বপ্ন নির্মাণটা তো খুব জরুরী।

ছয়. **এনজিওরা গণগবেষণার পথের কাঁটাঃ** হতদরিদ্রদের মধ্যে আগে যারা বিভিন্ন এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে গণসংগঠন করে তাদের সঞ্চয় দিয়ে সেল্ফ-হেল্প-ক্রেডিট-এর ফলে

তাদের আর চড়া সুদে ক্ষুদ্রঋণ নিতে হচ্ছে না, এবং তারা বলছেন যে, আমরা আর চড়াসুদের ব্যবসায়ীদের থেকে ক্ষুদ্রঋণ নেই না, আর কখনো নেবোও না – এ কথার শক্তি অনেক। কোন কোন গণসংগঠন ঘোষণা দিয়েছে – আমাদের গ্রামে ক্ষুদ্রঋণের নামে মহাজনী ব্যবসাকে আর চলতে দেয়া হবে না। এমন উদাহরণ দিনে দিনে বাড়ছে। এই ঘোষণা অবশ্যই একটি সাহসী প্রতিবাদ এবং এর মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, হতদরিদ্রদের মাঝেও সচেতনতা ও আত্মশক্তির বিকাশ ঘটেছে। এই প্রতিবাদীরা এতদিন দেখতে পান নি, একসাথে মাথা খাটিয়ে নিজেদের মধ্যে 'একতা' গড়ে তুললে, নিজেদের সঞ্চয় থাকলে, এর শক্তি কত বিশাল হতে পারে। এখানে চ্যালেঞ্জের দিকটি হলো, বর্তমানে যারা ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি শোধ করতে করতে একাধিক এনজিওর 'ক্ষুদ্রঋণের জালে' আটকে পড়েছেন, তারাও নিজেদের মধ্যে গণগবেষকদের মতো সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে – এদেরকে সম্পৃক্ত করার পথ খুঁজে বের করা। গণগবেষকরা মনে করে, 'এ ধারা (গণগবেষণা) এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসার সর্বনাশ ডেকে আনবে'। ঠিক এ কারণেই ক্ষুদ্রঋণ-প্রদাননির্ভর এনজিওর জন্য গণগবেষণা একটি হুমকি। তাই আশংকা করা হচ্ছে, এই এনজিওরা গণগবেষণার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না তো?

সাত.**আমাদের সীমাবদ্ধতাঃ** গণগবেষণা-সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করার সময় হয়তো অসচেতনভাবেই আমরা 'অন্যের' সময় নষ্ট করে বসি, কিন্তু তা বিবেচনাতেই নেয়া হয় না। এই 'অন্যরা' হতদরিদ্র নারী-পুরুষ হলে, তারপরেও তা বিবেচনায় না নিলে, এটা চতুরতার পর্যায়ে পড়ে যায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান গত মে ২৬-২৮, ২০০৭-এ কোলকোন্দ, ভরতখালি ও মুক্তিনগর ইউনিয়নে গণগবেষণার অগ্রগতি দেখতে গিয়েছিলেন। যে সকল গণসংগঠনের সাথে আনিসুর রহমানের আলাপ হয়েছে, তারা সকলেই বসেছিলেন দিনের বেলায়। বসার সময় দিনে হবার কারণে অনেককেই তাদের হাতের কাজ ফেলে আসতে হয়েছে। এর একটা আর্থিক মূল্য আছে। এই যে একদল হতদরিদ্র মানুষ আর্থিকভাবে এখানে ক্ষতিগ্রস্ত (যতুটুকুই হোক) হলেন, এটা স্থানীয় সহায়ক এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীদের কারেরই চোখে পড়ে নি। আনিসুর রহমান কিন্তু ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন – কেন তাদের আর্থিক ক্ষতির বা সময়ের মূল্য দেবার কথা ভাবা হয় নি? কেন এমনটা ঘটলো? হতদরিদ্র মানুষগুলো আমাদের (সুবিধাবাদী) চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে! না-কি আমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গীর দৈন্য? কিন্তু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইলেই (চতুরতা না হলেও) গণগবেষকরা তা মেনে নেবেন, তার প্রতিবাদ করবেন না? অন্যায়, অযৌক্তিক জেনেও তার প্রতিবাদ না করার অর্থ কী?

এখানেই শেষ নয়, শুরু ...

দারিদ্র্য দূরীকরণে হতদরিদ্রদের এ অনুসন্ধান চলমান। ফলে গণগবেষণায় অর্জিত এসকল বৈচিত্র্যময় শক্তি, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার এখানেই শেষ নয়, শুরু ...। অনুসন্ধান থেকে যা এখন খুবই স্পষ্ট তা হলো, গণগবেষণা কেবল হতদরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠিত করতেই নয়, সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করারও একটি শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠছে। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে ওঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে – মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় হতদরিদ্রদের নেতৃত্বে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন নয়। অভিজ্ঞতা বলে, গণগবেষণায় অর্থের বেশি দরকার হয় না, বরং বেশি অর্থ গণগবেষণায় হুমকি। দরকার হতদরিদ্র মানুষের স্বাধীনভাবে যৌথচিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সহায়ক পরিবেশ এবং এতে মালিকানা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।